জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-২২
Sunnat and Science

সুন্নাত ও বিজ্ঞান
Sunnat and Science

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

সুন্নাত ও বিজ্ঞান
Sunnat & Science

[রাসূল (সা)-এর কার্যাবলি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এর বিশ্লেষণ]

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ।
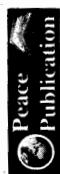
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সুন্নাত ও বিজ্ঞান

[রাসূল (সা)-এর কার্যাবলি এবং আধুনিক
বিজ্ঞানের আলোকে এর বিশ্লেষণ]

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-25

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা।

Sunnat & Science Dr. Zakir Naik Translated By Md. Abdul Qader Mia Published By Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 55.00

উৎসর্গ

মা- যার পিটুনীর ভয়ে মানুষ হওয়ার পথে চলার চেষ্টা......

আব্বা- যার দরদ ভরা চোখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে পরিপূর্ণ মানবরূপে, মানবতার শিক্ষক হিসেবে এবং পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সালাত ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যাঁর সুন্নত তথা আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীবাসীর সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে পঞ্চম বইটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত; যদিও মূল বইটি উচ্চ শিক্ষিত উর্দুভাষীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজি মিশ্রিত ভাষায় রচিত ছিল। সহজ-সরল বাংলা ভাষায় তা রূপান্তরের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ বইটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত-বন্দেগীসহ তাঁর কার্যাবলির উপকারিতা চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন চিন্তানায়ক ডা. জাকির নায়িক। তাঁর অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা ধারা পাঠ করে অবশ্যই পাঠকবর্গ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তাতেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিশ্ব মানবতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের মাধ্যমে সত্যিকারের কল্যাণ হাসিল করুন এ দুআ ও কামনা রইল। ব্যবস্থপনা পরিচালক পিস পাবলিকেশন মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্পাদক, কারেন্ট নিউজ)সহ সকলের জন্য শুভ কামনা, এ সাথে সবার নিকট উভয় জগতের কল্যাণ কামনায় দুআ চেয়ে শেষ করছি।

অনুবাদক,

তাং-১৯-০১-২০০৯

ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংকীর্ণতার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

তবে দ্বিতীয় ইচ্ছা আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ হজ্জ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

কোলকাতা বইমেলা-২০০৮ এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বইও দেখলাম বেশ ক'টি। তবে সবগুলো বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলা অনুবাদ করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতের নাগালে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোক দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের একটি উসীলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হননি। সে যাই হোক ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন; সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা হিসেবে নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এমন কিছু সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

ফেব্রুয়ারী ২০০৯ — প্রকাশক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাত ও বিজ্ঞান

এ বক্তৃতায় পবিত্রতা অর্জন, মিসওয়াক, অজু ও নামাযের শরয়ী মর্যাদা এবং সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ডাক্তারি দৃষ্টিতে এর উপকারিতা গবেষণার দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইসলামে পবিত্রতা অর্জন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সকল প্রশংসা সে অভিভাবকের জন্য, দরূদ ও সালাম তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর তাঁর বংশধর ও পরিবারের ওপর।

ইসলামে تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ–"তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও"-এর নির্দেশ এসেছে। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার চরিত্রে রঞ্জিত হও। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা অত্যন্ত পবিত্র। তাঁর সত্তা সকল প্রকারের খারাবি থেকে পবিত্র। একথা প্রসিদ্ধ যে, পরিচ্ছন্নতার ওপর আল্লাহর জ্যোতি আছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি চুরি চুকারী এবং ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র। কোন ধরনের ফেরেববাজি, রিয়াকারী এবং হিংসা-বিদ্বেষ যেমন তাঁর সত্তার সাথে খাপ খায় না কৃপণতা, তেমনি সংকীর্ণতার মত খারাপ দোষগুলো থেকে তিনি সদা-সর্বদা সত্তাগতভাবে পাক পবিত্র। তাঁর গুণাবলি পবিত্র ও প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত এবং মাজীদ। সুতরাং নিদের্শ হলো, হে মুসলমানগণ মাখলুক বা সৃষ্টি জীব হওয়ার কারণে তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তোমরাও চরিত্র এবং প্রভুর গুণাবলি নিজেদের মধ্যে ধারণ কর।

বাস্তবিকপক্ষে ইহা স্পষ্ট যে, একজন প্রকৃত আমলদার মুসলমানের জীবন সকল দিক থেকে পাক-পবিত্র, সকল প্রকারের অনিষ্টকারী জীবাণু থেকে সংরক্ষিত। তিনি সকল প্রকারের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পাক ছাফ হয়ে থাকেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না। চুরি ডাকাতি ও ব্যভিচার করবেন না। গালি-গালাজ করবেন না। সর্বদা সত্য বলবেন এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবেন। প্রদর্শনী থেকে আত্মরক্ষা করবেন। ফেরেববাজি, ধোঁকাবাজি

কখনো করবেন না। নিজস্ব কাজ ও কথায় সকল মুসলমান নিজেদের দৃষ্টান্ত নিজে হবেন। অপরকে কখনো কষ্ট দিবেন না এবং ক্ষতি করবেন না। বরং সর্বদা অন্যদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দুর্বলদের সাহায্য করবেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন এবং অন্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন না।

নবী করীম ইরশাদ করেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ -

"প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলমান তিনি যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

আরেকটি সুউচ্চ ঘোষণা রয়েছে, নবী ﷺ ঘোষণা করেন, "তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ নিজিস না চাবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহীহ আল-বুখারী, ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা ঈমানের অঙ্গ অধ্যায় ১৩নং হাদীস।)

সকল মুসলমানের জন্য নির্দেশ হলো হালাল খাবে, হারাম থেকে বেঁচে চলবে, নিজের চিন্তাধারাকে পাক-পবিত্র রাখবে। দেহকে পবিত্র রাখবে, পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখবে, নিজ কথা ও কাজকে পবিত্র করবে, মিথ্যা বলবে না এবং কার্যাবলিও পবিত্র রাখবে। যেন এ অনুভূতি হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র দেহ।

ইসলামী শিক্ষায় নামাযের বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। নামায আদায়ের জন্য শর্ত হলো, ব্যক্তির দেহ পাক-পবিত্র হবে। তার পোশাক পবিত্র হতে হবে এবং তিনি অজুবিশিষ্ট হবেন। নামাযের পূর্বে সকল প্রকারের শারীরিক পবিত্রতা আবশ্যক। নবী পাক ﷺ ঘোষণা করেন।

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" (সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি ছাপা -১১৮)

অপর স্থানে ঘোষণা করেন ঃ الطهور نصف الايمان। "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" (সুনানে তিরমিযী আরবি ছাপা - ১৯০)।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, এক মুসলমানের জন্য তার ঈমানের অংশ হলো সর্বদা পবিত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র থাকবে। ইসলাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য

পবিত্রতার শিক্ষা এমন পরিমাণ দিয়েছে যে, অমুসলমানদের পথিকৃৎগণও একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইসলাম যে পারিমাণ পবিত্রতার ওপর জোর দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম তা দেয় নি। অতএব ডা. রবার্ট স্মীথ, বিখ্যাত সার্জন মাসলামা, দক্ষ সার্জারি লিখেছেন, "আমরা পবিত্রতার আমল ইসলাম থেকে শিখেছি।"

সবচেয়ে বড় গান্ধা ঐ জিনিস যা মানুষের দেহ থেকে পায়খানা পেশাবের আকারে বের হয়। ইসলাম এগুলো বের হওয়ার পর উত্তমরূপে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা) অর্জন করার নির্দেশ দেয়।

যেহেতু নির্দেশ আছে যে, যদি মানুষের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে এ প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্থাৎ ইস্তিঞ্জা করবে। প্রথমে উত্তমরূপে মাটির ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করবে এরপর দুইবার পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করবে। অথবা পুনরায় পানি দ্বারা যথেষ্ট করবে।

পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পায়খানা পেশাব করার সময় কিবলার দিকে পিঠ অথবা মুখ করা যাবে না, চাই সেটা খোলা জায়গা হোক বা ঘর হোক। যদি ভুল করে এমন করে তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নিবে। পেশাব পায়খানা করার সময় খালি মাথায় যাবে না এবং বাতাসমুখী হয়েও বসা যাবে না।

পায়খানা পেশাবখানায় যাওয়ার সময় মুস্তাহাব হলো বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দুয়া পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি খবীস (দুষ্ট) জ্বিন পুরুষ এবং জ্বিন নারী থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (ফাতহুল বারী খ-১ আরবি পৃ-২৪৪; সহীহ বুখারী খ-১, আরবি পৃ-৪৫; সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি পৃ-২৮৩)

আবার পায়খানা করতে বাম পা ভিতরে রাখবে, যখন বসার নিকটবর্তী হবে তখন শরীর থেকে কাপড় গুছিয়ে নিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেহ খুলবে না। পা ছড়িয়ে বা পায়ের ওপর জোর দিবে এবং সে চুপ থেকে প্রয়োজন সারবে। যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গের গোড়া থেকে আগার দিকে চাপ দিবে যাতে যে ফোঁটা ভিতরে রয়েছে তা বের হয়ে যায়। অতঃপর পানি, ঢিলা অথবা একের পর অন্যটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। এর পূর্বে তিনটি ঢিলা দ্বারা

পবিত্রতা অর্জন করবে অতঃপর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা ধোবে। পানির পাত্র এমন উঁচুতে রাখবে না যাতে ছিটা গায়ে লাগার আশঙ্কা থাকে। প্রথমে পেশাবের স্থান ধোবে পরে পায়খানার স্থান। পায়খানার স্থান ধোয়ার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের জোর কমিয়ে ঢিলে রাখবে এরপর উত্তমরূপে ধোবে, যাতে ধোয়ার পর হাতে কোন গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর কোনো পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে নিবে। যদি কাপড় না থাকে তাহলে বারবার হাত দ্বারা মুছবে। একথা স্মরণ রাখবে যে, খাড়া হওয়ার পূর্বে শরীর ঢেকে নিবে এবং বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করবে এবং এ দুয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ -

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার নিকট থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দিয়েছেন এবং উপকারী দ্রব্য নিকটবর্তী করেছেন।"

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আরো একটি দুয়া রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে। যখন রাসূল ﷺ হাজত প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন তখন সে স্থান ত্যাগ করে পড়তেন غفرانك -"হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।" (যাদুল মায়াদ, খ-২, আরবি পৃষ্ঠা -৩৮)

ইস্তিঞ্জা পানি অথবা ঢিলা দিয়ে অথবা উভয়ের দ্বারা করা উচিত। হাড় অথবা গোবর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ। কেননা এগুলোর মধ্যে ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে।

৩. আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

পায়খানা পেশাব মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্যতম। নবী কারীম ﷺ প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মানবকল্যাণ ও সহজতর পথ-নির্দেশনা দিতেন। যদি নবী কারীম ﷺ-এর জীবন জিন্দেগী দেখা যায় তাহলে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহজতা ও বৈজ্ঞানিক দেখা যাবে।

আজ পৃথিবী পুনরায় তাঁর তরীকার দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে পন্থায় নবী কারীম ﷺ আমাদের জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতাগুলো নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

১. রাসূল ﷺ পায়খানা পেশাবের জন্য অনেক দূর হেঁটে যেতেন। পায়খানা পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার আলোকে কয়েকটি বাস্তব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি চলা ফেরার ওপর জোর দিচ্ছে এমনকি আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লিখা রয়েছে "পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন?"

একথা পরিষ্কার যে, পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এই জ্ঞানগত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে চলার দিকে আহ্বান জানানো। বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণ রসায়ন) এক দক্ষ পণ্ডিত এক পয়েন্টে তিনি বলেন ঃ

"যখন থেকে শহরের পত্তন ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষ ক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কেনানা যখন থেকে দৌড়ে পায়খানা পেশাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধরা, গ্যাস, পেট ও পাকস্থলীর পীড়াগুলো বেড়ে চলেছে।

চলার দ্বারা অন্ত্রগুলোর নড়া-চড়া বেড়ে যায়, যার দ্বারা পায়খানা পেশাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার মধ্যেই পেশাব করি এবং বাইরে চলে যাই না, এ জন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় থাকতে হয়।

২. রাসূল ﷺ পায়খানা পেশাবের জন্য কাঁচা এবং নরম জমীন বাছাই করতেন। এর মধ্যে ও অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। একটি বিশ্লেষণে দেখা যাক ঃ

লিউভাল পল (Louval Poul) নিজের পুস্তক "স্বাস্থ্যবিধি" তে লিখেছেন ঃ

"মানবতার স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন থেকে আমরা মাটির ওপর পায়খানা পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জমীন (ফ্লাশ, কমোড এবং ডব্লিউ সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে শুরু করেছি। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে জাতিগত দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বেড়ে গিয়েছে এবং এর প্রভাবে পেশাবের গ্লান্ডস (Prostate Glands)-এর ওপর পড়ে।"

মূলত , যখন মানুষের দেহ থেকে বর্জ্য বের হয় তখন মাটি এগুলোর জীবাণু এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে লুফে নেয়। যেহেতু ফ্লাশ ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি নেই। এজন্য ঐ সকল ক্ষতিকর ও জীবাণুর প্রভাব যা মাটি লুফে নিত ফ্লাশে পেশাব করার কারণে এ সকল জীবাণুর প্রভাব দুবার আমাদের দেহের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে রোগের দিকে ধাবিত হয়।

আরো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার লিখেন ঃ নরম ও কর্ষিত জমীন সর্ব জিনিসকে শোষণ করে নেয়। যেহেতু পেশাব এবং পায়খানা জীবাণু যুক্ত বর্জ্য, এজন্য এমন জমীন দরকার যা এগুলোকে শোষণ করতে এবং একে ছিটার প্রতিবন্ধক হয়ে শরীর এবং দেহের ওপর পড়া থেকে ফিরায়। যা ফ্লাশ টয়লেট দ্বারা হতে পারে না, সেখানেও ছিটার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বর্জ্যকে শোষণ করার কোনো গুণ নেই। ফ্লাশে প্রস্রাব করার কারণে বর্জ্যের বাষ্প শোষণ হতে পারে না যার কারণে বর্জ্য থেকে ভেসে আসা বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।"

এই পশ্চিমা সভ্যতা কমোড -এর প্রচলন করেছে যাতে মানুষ এর ওপর চেয়ারের মত বসে পায়খানা পেশাব করে। কমোডের ব্যবহারে লোকেরা উত্তমরূপে বর্জ্য মুক্ত হতে পারে না। কেননা ইহা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। এ ধরনের কমোডের কারণে পায়খানা সঠিকভাবে বেরও হয় না। এছাড়াও কমোডের ব্যবহারের পর পৃথক স্থানে বসে লজ্জাস্থান ধোয়ার প্রয়োজন হয়।

ডব্লিউ সি (W.C.) এক প্রকারের চেয়ার যাকে ইউরোপের লোকেরা পেশাব পায়খানার জন্য ব্যবহার করে। ডব্লিউ সি-এর ওপর চেয়ারের মতো বসে পেশাব পায়খানা করা যায়। ইহাতে মানুষের স্বাস্থ্য সুস্থতার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ধরনের চেয়ার সদৃশ জিনিসের ওপর পায়খানা পেশাব করায় বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কিছু শারীরিক কমতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো।

১. ডব্লিউ সী (W.C.) –এর ওপর বসে পায়খানা পেশাব করায় অঙ্গের টানা খেছা হয় যার দ্বারা মানবদেহের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

২. ডব্লিউ সী (W.C.) –র সহায়তায় পায়খানা করার কারণে প্রয়োজন পূরণ পরিপূর্ণভাবে হয় না, যার পরিণামে বিভিন্ন রোগের জন্ম হয়। যেমন– ধরা, বামা, পাকস্থলীর জ্বালা লজ্জা স্থানের ক্ষত, লজ্জা স্থানের জ্বালা পোড়া, গ্যাস ইত্যাদি।

৩. ডব্লিউসী (W.C.) –তে পায়খানা পেশাব করার জন্য চেয়ারের মতো বসতে হয়, যার কারণে পায়খানার সঠিক এবং প্রাকৃতিক বহির্গমন সম্ভব হয় না। এবং বর্জ্য বড় অন্ত্রে আটকে রয়ে যায়। যা অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়।

৪. ডব্লিউ সি (W.C.)-এর ওপর পায়খানা-পেশাবের দ্বারা পরবর্তীতে পেশাবের ফোঁটা পড়ার অধিক আশঙ্কা থাকে। আর এ ফোঁটা গড়ার কারণে ক্ষতসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।

৫. এতে ডব্লিউ সি (W.C.) অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না, যে কারণে অন্ত্র এবং পাকস্থলীতে অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ পাকস্থলীর জ্বালা বদ হজম এবং আলসার।

৬. ইহা নতুন সংবাদ যে W. C. স্থাপন শরীরের প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিপরীত। যখন সুন্নাত মুতাবিক পায়খানা-পেশাব করা হয়, তখন শক্তি পুরো শরীরকে ঢিলে করে দেয় এবং পায়খানার দ্বারকে পায়খানা বের করার উপযোগী করে দেয়। কিন্তু W. C. ব্যবহারে পূর্ণ শরীর ঢিলে হয় না এবং পায়খানার স্থানও সংকীর্ণ থাকে। যার কারণে মন, লিভার, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগ বালাই হয়ে থাকে।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখানো পন্থা খুবই উপকারী। এছাড়া কোনো ধর্মেই এরূপ কোনো দৃষ্টান্তই মিলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের নবী ﷺ-এর পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা ও আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। রাসূল ﷺ কী পরিমাণ সৌন্দর্যের সাথে মানুষের অপবিত্রতা ও পবিত্রতার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন যে আজ (এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে) **চিকিৎসাশাস্ত্রের** অভিজ্ঞগণ একথা বলতে বাধ্য হয়ছেন যে "বাস্তবেই নবী মুস্তফা ﷺ-**এর পবিত্রতার** বিধানের কোনো তুলনা নেই এবং রাসূল ﷺ-এর বর্ণিত এবং প্রদর্শিত **পন্থা খুবই** উপকারী।"

বর্তমানে প্রথমোক্ত **"ফ্লাশ" প্রাকৃতিক নিয়ম-পদ্ধতির নিকটবর্তী**। এজন্য এর ক্ষতি কমোড এবং W.C. (ডব্লিউ. সি.) **থেকে অনেক কম। কিন্তু কাঁচা পায়খানা** এবং নরম মাটিতে পায়খানা পেশাব করায় যে ধরনের উপকারিতা তা সেখানে পাওয়া যাবে না। যেহেতু মাটি এবং খোলা ময়দান সকল স্থানে পাওয়া সহজ নয় এ কারণে বর্তমানে ফ্লাশ উত্তম।

৩. রাসূল ﷺ পা ছড়িয়ে এবং বাম পায়ের ওপর জোর দিয়ে চুপ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়খানা পেশাব সারতেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ফিজিওলজির একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, 'আমি মারাকাশ ছিলাম। একজন ইহুদী ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। ডাক্তার যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। যখন আমি আমার নাম লিখালাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, আপনি কি মুসলমান?

আমি বল্লাম, জী হ্যাঁ। মুসলমান এবং পাকিস্তানিও।

ইহুদী ডাক্তার বলতে লাগলেন, তোমাদের পাকিস্তানে যদি স্বয়ং তোমাদের নবীর একটি পন্থা জীবিত হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানীরা কয়েকটি রোগ থেকে বাঁচতে পারে। আমি কৌতুল বশত) ব্যাকুল হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ ডাক্তার সাহেব সেটা কোন পন্থা?"

ইহুদী ডাক্তার বল্লেন, তা পায়খানা পেশাবের পন্থা। যদি পায়খানা পেশাবের জন্য ইসলামী পদ্ধতিতে বসা হয় তাহলে এপেন্ডিসাইটিস স্থায়ী ধরা রোগ পাইলস এবং গোর্দার রোগ জন্ম নিবে না। যদি মুসলমান স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতিতে পায়খানা পেশাব সমাধা করে তাহলে এ সকল পীড়া থেকে বাঁচতে পারে।"

পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেন, "আমি আমার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। আমার আফসোস হলো যে, আমি দ্বীনী জ্ঞানার্জনের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করি নি যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মাসয়ালাগুলো শিখে নিব। এ সময় আমার এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আমি এ ইহুদী ডা. -এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মারাকেশে একজন দ্বীনী আলিম ছিলেন। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলাম। যখন তিনি এ পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, তখনই আমি এরপর আমল শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার কিছু সময় লাগল, কিন্তু এর উপকারিতা খুব শীঘ্রই আমার বুঝে আসল এবং এ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি পায়খানা পেশাবের জন্য ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যে পদ্ধতিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই পায়খানা পেশাবের পদ্ধতির ওপর ধারাবাহিক রিসার্চ (গবেষণা) করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতা স্বীকার করছে।

স্বাস্থ্য এবং জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করাতে গ্যাস, বদ হজম, ধরা রোগ এবং গোর্দার রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায়, এবং বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এ সকল পীড়াকে মূলোৎপাটন করেও দেয়।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে ঢিল ব্যবহার করতেন এবং ঢিল বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ সুন্নাতের মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হলো ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নত মানের রোগ নিরাময়ের অংশ মওজুদ রয়েছে। যেহেতু পায়খানা ও পেশাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং জীবাণু ভর্তি হয়ে থাকে এ কারণে এটা মানব চর্মে লাগা সবচেয়ে ক্ষতিকর। যদি এর কোনো অংশ চামড়ার ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অগণিত পীড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন ঃ ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দুনিয়াকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল; কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির সকল অংশ জীবাণু ধ্বংসকারী। যখন ঢিলের ব্যবহার হবে তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে এর ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণ লেগে থাকা সকল জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। বরং গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের ক্যান্সার থেকেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন মাটি ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন। তার দ্রুত সুস্থতা লাভ করেছেন।

মোট কথা আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিকগণ এবং ডাক্তারগণের এ সিদ্ধান্ত এই যে, এ সকল মাটির মানুষ, পুনরায় মাটি থেকে আরোগ্য লাভ করে। চাইলে পৃথিবীর সকল ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতিগুলোর দ্বারা রোগ থেকে সুরক্ষা মিলবে।

আজকাল ইস্তিঞ্জা এবং পবিত্রতার জন্য টিস্যু পেপার অথবা টয়লেট পেপার ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা আগ্রহের সাথে এগুলোর ব্যবহার করো। সব লোকের ধারণা যে টয়লেট পেপারের চেয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার আর কিছুতে হয় না। অথচ টয়লেট পেপার দ্বারা কিছু না কিছু ময়লা শরীরের ওপর অবশিষ্ট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যদি গোসলের প্রয়োজন হয় তাহলে লোকেরা এভাবে টয়লেট পেপার দ্বারা অবশিষ্ট ময়লার সঙ্গে পানিতে বসে যায়, যার দ্বারা শুধু ঐ রোগই বাড়ে না বরং পাত্রের সকল পানি ময়লা ও গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যা গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যদি এতদসত্ত্বেও মানুষ এর দ্বারা গোসল করে তাহলে তার সর্বশরীর নাপাক ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এতো সেই পশ্চিমা সংস্কৃতি যার মধ্যে মানুষের ক্ষতি নিহিত। যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কখনো অনুসরণীয় হতে পারে না। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন–

"নতুন সংস্কৃতির ডিমগুলো পচা।"

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরীর এক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট এক ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি এই সংশ্লিষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ভাই বলুন তো, এই নরম কোমল ও চিকন টয়লেট পেপার তৈরিতে কোনো মারাত্মক কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় কি?

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলতে লাগলেন, "ডাক্তার সাহেব! এগুলো তৈরিতে অগণিত কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, কিছু কেমিক্যাল তো ক্ষতিকরের চূড়ান্ত, যার দ্বারা চর্ম রোগ, এক্সিমা এবং চর্মের রং পরিবর্তনের মতো রোগের জন্ম হয়ে থাকে।"

এ সময়ে সকল ইউরোপীয় টয়লেট পেপার ব্যবহার করছে। অতীত দিনের সংবাদে এ সংবাদ প্রচার করেছে যে, বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল, তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর শামিল ছিল। বোর্ডের বক্তব্য হলো, এ ধ্বংসকারী পীড়াগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং পানি ব্যবহার না করার কারণে বেড়ে চলেছে। ইউরোপ আমাদেরকে কাগজের আকারে যে তোহফা (উপহার) দিয়েছেন তা আমাদের জন্য লাভজনক না ক্ষতিকর তার ফায়সালা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।

যেহেতু ইউরোপীয়গণ ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু টয়লেট পেপারের ওপর নির্ভর করে এবং পানি ব্যবহার করে না এজন্য টয়লেট পেপার তাদের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হচ্ছে, তবে যদি টয়লেট পেপারের সাথে সাথে পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের ক্ষতি সমান সমান হয়ে যায়।

৫. রাসূল ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে ঢিল ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন "পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত।" (ছহীহ মুসলিম, ফিতরাতের অভ্যাস অধ্যায় আরবী, ছাপা নম্বর ৬০৪)

কিন্তু ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পরিবর্তে টিসু পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে, যার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে–এর মধ্য থেকে ইতঃপূর্বে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আরো কিছু বর্ণনা করছি।

এক ইউরোপীয় ডাক্তার "কিনান ডিউস" পুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধনাপূর্বক বলেন ঃ

যদি আপনারা এরূপ জিন্দেগী যাপন করতে থাকেন যে, পায়খানার স্থানকে পানি ব্যতীত টয়লেট পেপার দ্বারা পরিষ্কার করতে থাকেন, তা হলে আপনাদেরকে খুব শীঘ্রই নিম্ন লিখিত রোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

২. ভগন্দর অথবা ফিস্টুলা

৩. ভাইরাসজনিত রোগ

৪. চর্মের ইনফেকশন

বড় এবং ময়লা থেকে ইউরোপীয়গণ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে না। যার কারণে অবশিষ্ট ভারী ময়লা ও আবর্জনা লোম ও দেহে আটকে বিভিন্ন রকম রোগ জন্ম লাভে সহায়তা করে।

পানি সৃষ্টির প্রতি এক মহা নিয়ামত। এটা সকল নাপাকীকে পাক বা পবিত্রতায় রূপান্তর করে। ইসলাম পবিত্রতার বিধানকে এ পরিমাণ স্পষ্ট ও পাক বানিয়ে দিয়েছে যে, একে অমান্য করার সুযোগ নেই। এমনকি অমুসলিম বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণও এর প্রশংসা না করে পারে নি।

জন্ট মিলন প্রাচ্যবিদের বক্তব্য হলো, "ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। সকল ধর্ম এ থেকে নিজেদের পবিত্রতার অধ্যায় পূর্ণ করে। ইসলামের ইস্তিঞ্জার পন্থাও নজীরবিহীন। এর দ্বারা দেহের ওপর বর্জ্যের অনুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোনো দেহকে পানি ব্যতীত পরিষ্কার করা হয়, তবে অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, দেহের সম্পূর্ণ অংশ কখনোই পরিষ্কার হবে না, বরং বিভিন্ন রোগের বাহক হয়ে যাবে। আবার পানির ব্যবহারে দেহের এ অংশের (লজ্জাস্থানের) উষ্ণতার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা খুবই উপকারী হয়, যাতে এর দ্বারা পাইলস ইত্যাদি হতে পারে না। যদি পানি ব্যবহার করা না হয় তাহলে পায়খানা পেশাবের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো ছাড়াও অঙ্গগুলোর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৪. নিষিদ্ধ কার্যাবলী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য জোরালো নির্দেশাবলি দিয়েছেন। এ ছাড়াও পেশাবের সময় খাড়া হয়ে ও চলার সময় এবং পানিতে রাস্তায় ছায়াদার বা ফলদার বৃক্ষের নিচে বায়ুমুখী হয়ে গর্তের মধ্যে, গোসলখানায় পেশাব করতে, নিষেধ করেছেন। আর গোবর, হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা এবং কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডান হাত দ্বারা পানি ঢালতে এবং বাম হাত দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে, পায়খানা-পেশাবের পর কোনো জিনিস (সাবান অথবা মাটি) দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে এবং পায়খানা-পেশাবের সময় পর্দার প্রতি শতর্ক খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল শিক্ষার মধ্যে অগণিত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। এ সকল উপকারিতার মধ্য থেকে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে–

১। হাদীসগুলোতে অত্যধিক পরিমাণে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচার ওপর শাস্তির বাণী এসেছে এবং মুহদ্দিসীন স্ব স্ব সংকলিত কিতাবে এরূপ বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে পেশাব থেকে বাঁচা, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পেশাব এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে পেশাব থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা বেশিরভাগ কবর আযাব পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে হয়।"

প্রাচ্যবি. ড. জান্ট মিলন বলেন, রাণের ক্ষত ও ফাঙ্গাস, চর্ম উঠা রোগ, মৃগী এবং এর পার্শ্বের এ্যালার্জী এবং বিশেষ অঙ্গের রোগী যখন আমার নিকট আসে তখন তার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হয় যে, সে কি পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে?" এদের মধ্যে বেশিরভাগই পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে না, পুনরায় দুরারোগ্য ও সমস্যা জটিল পীড়া নিয়ে আমাদের নিকট আসে।"

জিনস -এর প্যান্ট-এর চেইন ও বোতাম খুলে পেশাব করার পর পুনরায় ইস্তিঞ্জা ব্যতীত ততক্ষণাৎ বেঁধে নেয়ার অবস্থায় পেশাবের ফোঁটাগুলো দেহের অঙ্গগুলোর ওপর পড়তে থাকে, যার দ্বারা চর্মরোগ এবং অন্যান্য রোগ জন্মলাভ করে।

আল্লাহর কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষা কতইনা উচ্চমানের যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাজার বছরের পুরাতন পূর্বের বর্ণিত যে, পেশাব নাপাক ময়লা কয়েকটি রোগের জন্মদাতা এবং কবর আযাবের কারণ। সুতরাং এ থেকে আত্মরক্ষা কর।

২. রাসূল ﷺ পেশাবকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফকীহগণ বলেন, যদি সওয়ারীর ওপর আরোহণ রত অবস্থায় পেশাবে চাপ দেয় তাহলে সওয়ারী থামিয়ে প্রথমে পেশাব করবে।

এভাবে যদি জামায়াতের সময় হয়ে যায় এবং পেশাবে চাপ দেয় তাহলে প্রথমে পেশাব করে অযু করে তারপর জামায়াতে শরীক হবে। কোনো কাজ কারার সময় পেশাব আসলে প্রথমে পেশাব করে নিতে হবে।" পেশাবকে বাধাগ্রস্ত না করা এবং সময়মত পেশাব করার মধ্যে নিম্ন লিখিত ডাক্তারী উপকারিতা রয়েছে।

মেডিকেলের মূলনীতিতে রয়েছে যে, যখনই পেশাব বা পায়খানা আসবে তখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। মেডিকেলে আবশ্যকীয় প্রয়োজন পেশাব-পায়খানাকে বাধাগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মেডিকেল ফিল্ডের সাথে সম্পৃক্ত সিনিয়রগণ বলেন, জরুরি প্রয়োজন (পায়খানা পেশাব)-কে বাধাগ্রস্ত করলে অনেক রোগ হয়, এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের। এ ছাড়া পাকস্থলী, স্নায়ু গোর্দান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো সময় জরুরি প্রয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করায় বমি ও চক্কর আরম্ভ হয়ে যায়, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে।

রাসূল ﷺ স্থির (বদ্ধ) পানিতে পেশাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এর ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ডোবা, পুকুর, খাদ ও ঝিলের বদ্ধ পানিতে যদি পায়খানা পেশাব করা হয়, তা হলে পানিতে জীবাণু প্রবেশ করে সকল পানি দূষিত ও ক্ষতিকর রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি কোনো জীবজন্তু (পাখি, পশু, মানুষ ইত্যাদি) ঐ পানি পান করে তাহলে তারা বেশ কিছু মারাত্মক রোগের শিকার হয়ে যাবে। এরূপ পানি পানকারীর জ্বালানি, উত্তাপ, টাইফয়েড, ভাইরাসজনিত জন্ডিস, অন্ত্রে কীটের ডিম্বাণু জন্ম লাভ করে, য ধ্বংসকারী রোগসমূহ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও বদ্ধ পানিতে পেশাবকারী নিজেও কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন– যখন বদ্ধ পানিতে পেশাব করা হয়, তখন পেশাব ছিটে শরীরের পড়ে, যা কিছু রোগের পক্ষে কাজ করে। বদ্ধ পানিতে পেশাব করাতে এক প্রকারের ভাপ উঠে যা পেশাবকারীকে কয়েক প্রকারের পীড়ায় আক্রান্ত করে। এই ভাপ-এর কারণে ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি শেষ হয়ে যায়। মানুষ চোখের রোগে আক্রান্ত হয় এবং তা মস্তিষ্ক ও গীলার ওপরও ঘোরতর প্রভাব ফেলে।

এ সকল কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব ও পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। যাতে কোনো লোকের কারণে প্রাণী অথবা অন্য কোনো মানুষের কোনোরূপ কষ্ট না হয় এবং ইসলামী সমাজ সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং রোগপীড়া থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবাহিত পানিতে পেশাব করতেও নিষেধ করেছেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবাহিত পানি যেমন সমূদ্র, নদী, খাল ইত্যাদির উপকূলে গ্রামের পর গ্রাম বসবাস করছে। বহু মানুষ ও প্রাণী এ পানি থেকে উপকার লাভ করে। যদি বর্জ্যের কারণে এ পানি ময়লাযুক্ত হয়ে যায় তাহলে চলতে চলতে জীবাণুর স্তূপ জমে যায় এবং রোগ ছড়িয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এ নদী বা খাল ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য পানি অতিক্রম করে, তখন তার শরীর যতখানি পানিতে ভিজে তাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ পানি দ্বারা এ্যালার্জী, ফোঁড়া, ফেন্সী এবং ভাবাই ক্ষত ইত্যাদিও ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও যখন কোনো ব্যক্তি প্রবহমান পানিতে পেশাব করে তা থেকে দুর্গন্ধ ওঠে যা থেকে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য সীমাহীন ক্ষতি হয়।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলাচলের স্থান ও রাস্তায় পেশাব করতে খুবই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি, চিকিৎসাগত উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

রাস্তায় সকল কিছু অতিক্রম করে এবং যখন রাস্তায় পেশাব করা হয় তখন পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে তা রাস্তায় অতিক্রমকারীর দেহে সংক্রমিত হয়, যার দ্বারা শ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু যদি কোনো মানবদেহে পৌঁছে তাহলে হৃদরোগ, পেটের পীড়া বতি রোগের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

৬. হাদীসসমূহ এবং ফিকহের কিতাবে ছায়াদার এবং ফলদার বৃক্ষের নিচে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কয়েকটি প্রাকৃতিক, ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা হলো ঃ

ছায়াদার বৃক্ষ লোকদের দাঁড়ানো ও বিশ্রামের স্থান। এখানে বর্জ্য ত্যাগ করা চূড়ান্ত রকমের অন্যায় এবং এ থেকে নিশ্চিতই খারাপ প্রভাব পড়ে। এ ধরনের বৃক্ষের নিচে উপবেশনকারীর বেশ কয়েক প্রকারের রোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ফলদার বৃক্ষ যেখানে লোকদের দাঁড়ানো ও আরাম করার স্থান, এটা ফল আহরণের স্থানও বটে এবং লোকেরা তার ছায়ায় বসে ফলও খায়। যদি সেখানে

আবর্জনা করা হয় তাহলে সেখানে বসে খাওয়া মুশকিল হবে এবং মানুষ কষ্ট পাবে। এছাড়া ফলদার বৃক্ষ থেকে নিজে নিজেও ফল পড়ে থাকে। যদি ফলদার বৃক্ষের নিচে পায়খানা পেশাব করা হয়। তাহলে ঐ ফলগুলো অবশ্যই এ ময়লার মধ্যে পড়তে। যে কারণে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবে না এবং যদি কেউ এ ফল খেয়ে ফেলে (যেমন অবুঝ শিশু ইত্যাদি) তাহলে সেও কয়েক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, যার দ্বারা অনেক কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

৭. হাদীস এবং ফিকহে বাতাসের দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

যদি বাতাসমুখী হয়ে পেশাব করা হয় তাহলে বাতাস প্রবাহের কারণে ঐ পেশাব উল্টে-শরীর, চেহারা ও কাপড়ের ওপর পড়বে, যা দ্বারা দেহ ও কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। যদ্দরুন এ পেশাবের জীবাণু এ পেশাবের রাস্তা থেকে দেহে প্রবেশ করে এ্যালার্জি, খোসা পাঁচড়া, রক্তদূষণ এবং আরো কয়েকটি চর্মরোগ সৃষ্টি করবে।

যদি বায়ুর দ্বারা পেশাব উল্টে মুখ এবং চোখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে অনেক কঠিন ক্ষতি হয়। যেমন– চোখ যাবে, ক্ষত হবে, চোখে চুলকানী হবে, চোখ থেকে পানি পড়বে এবং এর সাথে সাথে চোখের বেশ কয়েকটি রোগ সৃষ্টি হবে। যদি চিকিৎসা না হয় তাহলে এ রোগগুলো বৃদ্ধি পেয়ে সারা শরীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। যদি বায়ুমুখী হয়ে পেশাব করা হয় এবং পেশাব উল্টে মুখে প্রবেশ করে তা হলে তা দ্বারা কয়েক প্রকারের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন– মুখের রোগ হয়ে যায়। এছাড়া মুখে তখন মাড়ির পুঁজ ও দাঁতের রোগ সৃষ্টি হবে। জিহ্বা ও খারাপভাবে প্রভাবিত হয় এবং গিলাও খারাপ হবে যাতে পানি পর্যন্ত লাগানো যাবে না।

৮. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। যেরূপ মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মারজাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কখনোই গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবী পৃষ্ঠা ৪৩)।

গর্তাদির মধ্যে পেশাব থেকে বিরত থাকার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো ঃ

যদি বিষাক্ত প্রাণীর গর্তে পেশাব করা হয় তাহলে এ প্রাণী বাইরে বের হয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা প্রবল।

কিছু মাটির গর্ত এমনিতেই হয়ে থাকে এবং সে গর্তাদির মধ্যে এসিড এবং নাইট্রোজেন জমা হয়ে থাকে। যদি এর মধ্যে পেশাব করা হয়, তাহলে পেশাব

যেহেতু নিজেই এক প্রকারের এসিড সেহেতু অন্য প্রকারের এসিডের সাথে এটি মিলিত হয়ে বাষ্প উঠে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে।

৯. রাসূল ﷺ গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আরো ইরশাদ করেছেন ঃ এর দ্বারা অগণিত কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, গোসলের স্থানে পেশাব না করা উচিত। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান ও মেধার ওপর প্রভাব পড়ে স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এবং কয়েকটি রোগ আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (Science and Health) "বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য" নামে একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিনে বর্ণিত আছে ঃ গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা যৌন রোগ বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা সামাজিক ধ্বংস সৃষ্টি হয়। গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা মানুষ শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা আরো অনেক ধরনের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

১০. নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন, এর ওপর বায়হাকী শরীফের হযরত জাবির (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন যে, কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করবে।" (বায়হাকী শরীফ, খ-১, পৃ-১০৬)

ইসলাম বসে পেশাব করার নির্দেশ দান করে। বেলনা দাঁড়িয়ে পেশাব করার দ্বারা অগণিত অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে থাঁকে। যেহেতু পেশাব হতে জীবাণু বের হয় এবং অনেক সময় এর মধ্যে অনেক রোগ (সিফিলিস, গণোরিয়াম মূত্রাশয়ে জীবাণুর ইনফেকশন ইত্যাদি)-এর কারণে পুঁজ জমা হয়। খাড়া হয়ে পেশাব করাতে এর ছিটে শরীর ও পোশাককে ময়লাযুক্ত করে এবং এর দ্বারা অনেক রোগের সৃষ্টি হয়।

দাঁড়িয়ে পেশাব করায় Prostatitis-এর ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তা প্রসারিত হয়ে বেড়ে যায় এবং যার কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি পেশাব ফোঁটা ফোঁটা আসে এবং ফোঁটাও পাতলা হয়ে যায়। এছাড়াও আরো কিছু রোগ জন্ম লাভ করে।

১১. নবী করীম ﷺ গবর, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে সালমান ফারসী (রা) বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন। "গোবর (প্রাণীর বর্জ্য) হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা (ছহীহ মুসলিম খ-১, পৃ-১৩০) (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবী পৃ-৪২)

গোবরের মধ্যে অগণিত ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। কেননা এটা এক প্রাণীর বর্জ্য (পায়খানা) এবং সকল বর্জ্যই জীবাণু পূর্ণ থাকে। গবরের মধ্যে টিটেনাস এবং টাইফয়েড-এর জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। যদি গবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয় তাহলে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে অসুখ করে ছাড়ে। এছাড়াও এর দ্বারা লজ্জাস্থানের অনেক পীড়া হয়ে থাকে। যেমন– খোস-পাঁচড়া, পুঁজ পড়া, লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ইত্যাদি।

হাড়ের গোশত খেয়ে যখন নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁকে প্রাণীরা (কুকুর বিড়াল) খায়। কিছু প্রাণীর লালার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে। যেমন– কুকুরের লালায় এক বিশেষ ধরনের জীবাণু থাকে, যা তার ভক্ষণকৃত হাড়ে সংক্রমিত হয়। এর সাথে ও হাড়ের ওপর মাটি, ময়লা ধুলাবালি ও দুর্গন্ধ জমে যায় এবং এ ধরনের ময়লা-ধুলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যদি এ হাড় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে যাবতীয় জীবাণুর সাথে সাথে কুকুরের বিশেষ জীবাণুও দেহের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। যার দ্বারা রক্তদূষণ, হার্ট, জঠর, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ হয়।

হাড়ের উপরিভাগ, অসমান, রুক্ষ ও ধারালো হওয়ায় এর দ্বারা মানবদেহ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়াও হাড়ের ওপর ভূমির হিংস্র জানোয়ার থেকে এমন জানোয়ার থাকে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না, যেগুলো কষ্টদায়কও বটে। ইস্তিঞ্জা করার সময় এদের দ্বারা ক্ষতি হতে পারে।

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন যে, "আমি এক নওজোয়ানকে এ হাদীস মুবারক শুনালাম যে হাড়, গোবর এবং বিষ্ঠা দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা যাবে না, তখন সে ঠাট্টা করল। এর মধ্যে কোনো একদিন তার প্রয়োজন হলো এবং পায়খানা করার পর সে হাড় দিয়ে পরিষ্কার করল। যে কারণে পায়খানার স্থানে কঠিন যন্ত্রণা হলো এবং ফুলে গেল। এতে যা হয়েছে তা হলো সে যে হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছিল এর মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র এবং বিষাক্ত পিপড়া ছিল যা সে দেখেনি।"

যখন সে পরিষ্কার করার জন্য এ হাড়কে পায়খানার রাস্তায় রাখল তখন এ সকল পিঁপড়া তাকে কেটে ছেড়েছে।

৪. বুযুর্গ বর্ণনা করেন

এ নওজোয়ানের যখন অতিরিক্ত কষ্ট হলো তখন সে আমার নিকট ভুলের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য লজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার জন্য আসলো। আমি তাকে বল্লাম, "যে নেক বান্দার হাদীসকে তুমি ঠাট্টা করেছিলে, তার পরে দরূদ পাঠাও। আল্লাহ তায়ালা এবং তদীয় রাসূলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বৎস, যখন সে এ সকল কাজ করল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে মুসীবত থেকে মুক্ত করে দিলেন।

হাড় ও গোবরের মধ্যে কয়েক প্রকারের মারাত্মক ক্রীট থাকে। এ কারণে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসার বিধানানুযায়ী এ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ রয়েছে।

১২. রাসূল ﷺ এর ইরশাদ মোতাবেক কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করা, পেশাব (পায়খানা) করার সময় মুখ পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পায়খানা পেশাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন।" (ছহীহ বুখারী, আরবী, পৃ-৫৭; ছহীহ মুসলিম, খ-১, আরবী, পৃ-১৩০; সুনানে আবী দাউদ, খ-১, পৃ-৩; (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবী, পৃ-২৪, ৪২)

পায়খানা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করার মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে

ডাঃ ডারভীন, ডা. লিডবীব, ডা. আলেক্সান্দ্রা-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী "কসমগ ওল্ড" এর মানবব্যবস্থা জীবনের জন্য সহযোগী। খানায়ে কাবার চারদিক থেকে বের হওয়া Positive Rays(ধনাত্মক রশ্মি) যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পেশাব, পায়খানা ও থুথু যা পুরোপুরি Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) কাবার দিতে নিক্ষেপ করাতে মানুষের জন্য ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হয়। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট "ডাক্তার কামিন বীম" এ কথাকে নিজ পরীক্ষা জীবনের অংশ বানিয়েছেন যে, মুসলমানদের কাবার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) পুরো সৃষ্টি জগতের ওপর পড়ছে এবং সেদিক Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) (থুথু, পেশাব, এবং পায়খানা ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা ক্ষতির কারণ।

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ "পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ডান হাত দ্বারা ঢেলো এবং পরিষ্কার করার জন্য বাঁ হাত ব্যবহার করো। সাবধান! ইস্তিঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করো না। যখন কোনো লোক পায়খানা পেশাবের জন্য যায়, তখন লজ্জাস্থান নিজ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (ছহীহ বুখারী খ-১ আরবী পৃষ্ঠা -২৭; ছহীহ মুসলিম খ-১, আরবী, পৃষ্ঠা -১৩০; মশকাতুল মাসাবিহ আরবী পৃষ্ঠা -৪২)

রাসূল ﷺ-এর এ বাণীর মধ্যেও কয়েক প্রকারের প্রাকৃতিক, চিকিৎসাগত এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা পাওয়া যায়, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ইস্তিঞ্জা শুধু বাঁ হাত দিয়েই করার উচিত। এর কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। ডান হাত থেকে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) এবং বা হাত থেকে Negative Ray (ঋণাত্মক রশ্মি) বের হয়। যদি ইস্তিঞ্জার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে

শরীরের রশ্মির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর খারাপ প্রভাব মস্তিষ্ক এবং হারাম মগজ (Spinal cord)-এর ওপর পড়ে।

এ ছাড়াও যেহেতু ডান হাত দ্বারা খানা খাওয়া হয় সুতরাং যদি ইস্তিঞ্জার জন্যও ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে খানা খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহারের সময় দুর্গন্ধ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

১৪। পায়খানা পেশাবের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মাটিতে হাত ঘষে ঘষে ধুতেন। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে যেমন ঃ

পায়খানা পেশাবের পর উভয় হাত ধৌত করা নবী কারীম ﷺ-এর সুন্নত। এর দ্বারা মানবদেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়ে থাকে।

যেমন ঃ আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরি। তাতে হাত খালি থাকে এর দ্বারা হাতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ জীবাণু অথবা বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যাল থাকে যা আমাদের হাতকে ময়লাযুক্ত করে। যদি হাত না ধুয়ে খানা খাওয়া হয়, কিংবা খাবারের প্লেটে হাত ঢুকিয়ে দেই, কুলি করা হয়, নাকে পানি দেয়া হয়, তাহলে এ সকল জীবাণু সহজে আমাদের খাবার, মুখ ও নাকের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দেহকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী হাত ধোঁয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার প্রফেসর "ডাক্তার শাহেদ আতহার" ঠিকই লিখেছেন ঃ

"Hand washing is being emphasized more and more in haspitals now in arder to prevent spread of germs. However non-Muslim did not know that hand washing is so important it has been ordered in Quran 1400 years ago." (Health guidelines from Quran and sunnah. p-60)

"বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে জীবাণু ছড়ানো রোধ করার জন্য হাত ধোয়ার ওপরে জোর দেয়া হয়েছে। অথচ অমুসলিমদের জানা নেই যে, হাত ধোয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার নির্দেশ ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে দেয়া হয়েছিল।"

যখন আমরা হাত ধুই তখন আঙুলের মধ্য থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন এক বৃত্ত তৈরি করে যার ফলে আমাদের ভিতরের বৃত্তশীল বিদ্যুতের শৃঙ্খলার বেগ বেড়ে যায় এবং বিদ্যুতের রশ্মি এক পর্যায়ে হাতের মধ্যে আসে। এ কাজের দ্বারা

হাত সুশ্রী হয়ে যায়। সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়ায় আঙুলের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা পত্রের ওপর পরিবর্তন হয়ে সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল এই যে, পায়খানা পেশাবের পর হাতকে মাটি দ্বারা ঘষে ঘষে ধৌত করতেন। যাতে হাতে লাগানো জীবাণুগুলো এবং কিছু জীবাণু এমনও হয় যে সাধারণ পানি দ্বারা তা ধ্বংস হয় না, এ জন্য এ হাতগুলোকে মাটি অথবা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মও।

মাটি উচ্চ পর্যায়ের এ্যান্টি সেপটিক। এমনকি এর দ্বারা কুকুরের জীবাণুও (যা সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণু) খতম করার শক্তিও তাক্‌ত আছে। এ জন্য ইহা সাধারণত জীবাণুগুলোকে দ্রুত গতিতে শেষ করে দেয়। আর এভাবে হাত ধোয়া প্রাকৃতিক দাবি ও বটে।

৬. মিসওয়াক

ইসলাম এবং মানবস্বাস্থ্য

ইসলাম যেমন মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি মুসলমানদের দেহ ও পোশাকের পবিত্রতারও নির্দেশ ও শিক্ষা দেয়। যদি ইসলামী পবিত্রতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে তার মাপকাঠি বিজ্ঞানের পন্থার চেয়েও উত্তমও সমুজ্জ্বল হিসেবে চোখে পড়বে। নামাযের পূর্বে মিসওয়াক ও অজুর নির্দেশ প্রদান করে। এটা আত্মিক ও শারীরিক উভয় দিকের উপকার সাধন করে। এ জন্য স্বয়ং মিসওয়াককে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

একজন মুসলমান পাঞ্জেগানা নামাজে একদিনে ১৫ বার মুখ পরিষ্কার করে। এ থেকে পরিষ্কার যে, মুসলিম নামাযী ব্যক্তির মুখ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। নামাযীকে নামাযের মধ্যে মহান স্রষ্টা ও মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করতে হয়, একারণে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় কাজ। মুখ পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ আসে। সঙ্গী নামাযীও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতে পারেন। এ ছাড়াও ময়লা মুখ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কীর্তন ও ইবাদত করার দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং নামাযে খুশু খুজুও অর্জিত হয় না। যদি মিসওয়াক ও পানি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায় তাহলে মুখে এমন রশ্মি

তৈরি হয় যার দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত ও প্রশংসা কর্তীনের মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়।

মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য মিসওয়াক করতে থাকায় দাঁত মজবুত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। দাঁতের নানা রকমের রোগের আশঙ্কা থাকে না। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মানুষের আস্বাদন শক্তি বেড়ে যায়। তারা গলা ইত্যাদির রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

মিসওয়াক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হলো।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি বলেছেন,

মিসওয়াককে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা এর মধ্যে পনেরোটি সৌন্দর্য রয়েছে।

ক. মুখকে পাক-ছাপ করে

খ. আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে যান

গ. শয়তান অসন্তুষ্ট হয়

ঘ. প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়

ঙ. আমার (রাসূল ﷺ-এর) সুন্নত আদায় হয়

চ. ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়ে যায়

ছ. পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়

জ. গরমের কষ্ট দূর হয়ে যায়

ঝ. মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়

ঞ. মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়

ট. কফ কেটে যায়

ঠ. মাড়ি শক্ত হয়ে যায়

ড. মিসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালোবাসে

ঢ. দারিদ্র্য এবং সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়

ণ. মিসওয়াক করে যে নামায আদায় করা হয়, তার ছওয়াব ষাট গুণেরও অধিক হয়।

২. হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করতে অলসতা করো না, কেননা ইহা মাড়ির দাঁতের ব্যথা দূর করে। দাঁত উজ্জ্বল থাকে এবং এর ব্যবহারে স্মৃতিশক্তিও বেড়ে যায়।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন ঃ "জুমুআর দিনে মিসওয়াক করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।"

৪. হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ নবীদের গুণাবলির মধ্যে একটি হলো মিসওয়াক করা।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন ঃ খানা খাবার পর মিসওয়াক করা দুজন কমবয়সী গোলাম আযাদ করার চাইতে উত্তম।"

৬. দয়ার্দ্র ও নরম দীল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মিসওয়াক করে নামায আদায় করা ঐ নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ ছাওয়াব বেশি, "যে নামাজের পূর্বে অজু করা হয় নি।"

৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ জীব্রাঈল আমীন মিসওয়াক-এর এত দূর ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, এটি ব্যবহারের এত তাকীদ দিয়েছেন যে, মনে হয় আমার আশঙ্কা হতো যে, মিসওয়াক আমার উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়ে যাবে।

৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ "তোমরা মিসওয়াক দ্বারা নিজেদের মুখ পাক ছাপ রাখ, কেননা ইহা মুখের হক।'

৯. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَ مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, যদি আমার নিকট কষ্ট মনে না হতো যে, মিসওয়াক করা উম্মতের ওপর কঠিন হয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার হুকুম (আবশ্যকীয়) করে দিতাম।' (ছহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ.- ৫৮৯)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ "মিসওয়াক করা নবীগণের সুন্নতের মধ্যে একটি সুন্নত।" (সুনানে তিরমিযী বিয়ের ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ১০৮০)

১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ক. মিসওয়াক করা নবীগণের পন্থা এবং তাদের অনুসরণ ও তাদের হেদায়াত তলব করা।

খ. মিসওয়াককারীর সঙ্গে ফেরেশতা মুসাফাহা করে এবং মহত্ত্ব ও উজ্জ্বলতার কারণে তার আগে পিছে থাকে।

গ. মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।

ঘ. মিসওয়াককারীর সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণ ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত যায়।

ঙ. সকল ফেরেশতা এবং আরশ বহনকারীগণ মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

চ. মিসওয়াককারীর জন্য বেহেশ্তের আট দরজা খোলা হয়ে যাবে, যাতে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে।

ছ. কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক ইসলামের গণ্ডিতে আশ্রয় নিবে, কিয়ামতের দিন তাদের সংখ্যাসম নেকী মিসওয়াককারীদের দেয়া হবে।

জ. মিসওয়াককারীর জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।

ঝ. সকল নবী ও রাসূলগত মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ঞ. মিসওয়াককারীর মুখস্থ শক্তি বেড়ে যায়।

ট. আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীর দিলে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন।

ঠ. মিসওয়াককারীর জন্য খাবার সময়ে শক্ত থেকে শক্ত গোশ্তও নরম হয়ে যায়।

ড. মিসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের ব্যথা দূর হতে থাকে।

ঢ. মিসওয়াককারীর কবর মিসওয়াকের বরকতে প্রশস্ত করা হবে।

ণ. আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বরকত মিসওয়াককারীর ঘরে অবতীর্ণ হয়।

ত. মিসওয়াককারীর সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

থ. প্রত্যেক দাঁত এবং আঙ্গুলের করের সংখ্যানুপাতে পাঁচ পাঁচটি নেকী মিসওয়াককারীর আমলনামায় (মিসওয়াক বা ব্রাশ করার কারণে) লিখা হয়।

দ. মৃত্যুর সময় মৃত্যুর ফেরেশতা রূহ কবজ করার জন্য মিসওয়াককারীর নিকট খুবই ভালো আকৃতিতে আসে, যেরূপে নবী রাসূল পাকের নিকট আসেন।

ধ. মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) মিসওয়াককারীর রূহ এমতাবস্থায় নিয়ে যাবে যেন তিনি পাক পবিত্র থাকবেন।

ন. দুনিয়া থেকে পুনরুত্থানের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীকে সুস্বাদু শরাবে তুহুর দ্বারা আপ্যায়ন করবেন।

প. মৃত্যুর পর মিসওয়াককারীর কবরে দুনিয়ার সামান প্রশস্ততা তৈরি করা হবে।

ফ. জমীনের কীট-কীড়া এবং কষ্টদায়ক প্রাণী মিসওয়াককারীকে কষ্ট দেবে না।

ব. কিয়ামতের দিন মিসওয়াককারীদেরকে নবীদের মতো পোশাক পরানো হবে।

ভ. আল্লাহর তায়ালার মহান দরবারে মিসওয়াককারীদেরকে নবীদের মতো সম্মান হবে।

ম. আল্লাহ তায়ালা মিসওয়াককারীদেরকে নবী ও শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

য. আমলের দাঁড়িতে মিসওয়াককারীর পাল্লা ভারী থাকবে।

র. মিসওয়াককারীর জন্য হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিবেশী হিসেবে জান্নাতে মহল তৈরি হবে।

ল. মিসওয়াককারী আমার (রাসূল ﷺ-এর) সুপারিশ দ্বারা ভূষিত হবেন।

ব. সবচে' বড় সৌভাগ্য এই যে, মিসওয়াককারী আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীগণের দশটি সুন্নত বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিসওয়াক করাও রয়েছে।

১৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন ঃ "মিসওয়াক মুখকে পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ"

১৪. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম ﷺ দিন বা রাতে যখনই শোয়া থেকে উঠতেন, তখন অজু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, যিনি রাত্রি জাগরণ করেন তার মিসওয়াককরণ অধ্যায় পৃ-৫৭)

১৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন ঃ "যখন বান্দা মিসওয়াক করে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার তিলায়াত খুব মনোযোগ সহকারে শুনে অতঃপর তাঁর খুব নিকটে এসে যায়, এমনকি তার মুখের ওপর রেখে দেয়। কুরআন-মাজিদের যে শব্দই এ নামাযীর মুখ থেকে বের হয় সোজা ফেরেশতার পেটে চলে যায়। এ জন্য তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মুখ সাফ রাখ।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খ-২ পৃ-২৬)

১৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন ঃ "মিসওয়াক করে দু'রাকায়াত নামায পড়া, মিসওয়াক ব্যতীত ৭০ রাকায়াত পড়ার চেয়ে উত্তম।" (জাওয়ায়েদ খ-২ পৃ-২৬৩)

১৭. হযরত শুরাইহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? সাইয়েদা আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।" (সহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ-৫৯০)

১৮. হযরত যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ নিজ ঘর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি মিসওয়াক করতেন।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ-২, পৃ -২৬৬)

ইসলামের নবী ﷺ দুনিয়ার মধ্যে অতুলনীয় পথপ্রদর্শক-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। ইতিহাস মহানবী ﷺ-এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম ছিল অক্ষম আছে এবং অক্ষম থাকবে। রাসূল ﷺ জীবনের যে নিয়ম পেশ করেছেন তাও তুলনাহীন। রাসূল ﷺ মানব জীবনের কোনই প্রাথমিক প্রয়োজন ছেড়ে দেননি। তদুপরি রাসূল ﷺ শুধু মৌখিক (Theoretically) হিদায়াতই দান করেন নি ,বরং স্বয়ং আমলের (Practically) দিক থেকেও সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান করেছেন। নবী কারীম ﷺ স্বয়ং আমল করে সকল লোকের জন্য নিজ আমলকে সুন্নত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার তাঁর সুন্নাতের ওপর আমলকারীদের জন্য অনেক প্রতিদান ও ছওয়াবের সুসংবাদও দান করেছেন।

মিসওয়াক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশনার ওপর তিনি খুবই চিন্তা করেছেন যে, কী পরিমাণ আগ্রহ ও জোরের সাথে রাসূল ﷺ মিসওয়াকের উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যবহারের ওপর কী পরিমাণ পছন্দ প্রকাশ করেছেন।

আজকাল ব্রাশ (Tooth Brush) এবং পেস্ট (paste) ব্যবহারের এক নতুন সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পেস্ট এবং ব্রাশ যেমন পরিমাণ উপকার দান করে তেমনি ক্ষতিও করে। এরূপ নতুন সংস্কৃতির চমকের দিকে আকৃষ্ট লোক, সস্তা, সহজ, উপকারী এবং প্রাকৃতিক জিনিস মিসওয়াককে ত্যাগ করে বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। লোকেরা দাঁত, মাড়ি, গলার রোগের শিকার হয়ে দেহের বহুলাংশের রোগের কারণ নিজেরাই সৃষ্টি করছে।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা হতো তাহলে দুনিয়ার মধ্যে দাঁতের রোগ এবং ডেন্টাল সার্জনের অস্তিত্ব এতটা আসত না এবং লোকেরা এত কষ্টও ভোগ করত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক এর ব্যবহারের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন এজন্য যে, এর মধ্যে অনেক চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

মিসওয়াক ঃ নতুন চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মিসওয়াক ও জীবাণু

মিসওয়াক জীবাণু হত্যাকারী Anti Septic, ইহা মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর করে। ইহার ব্যবহারে মুখের ভিতরের জীবাণু মরে খতম হয়ে যায়। এভাবে মিসওয়াককারী ব্যক্তি মুখের রোগ থেকে বেঁচে থাকেন। নতুন গবেষণা অনুযায়ী কিছু এমন জীবাণুও হয় যা প্রচলিত ব্রাশ এবং পেস্ট দ্বারা দূর হয় না বরং সেগুলোকে শুধু মিসওয়াকই শেষ করতে পারে।

মিসওয়াক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা এবং মেডিক্যাল সাইন্স প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য অটুট থাকে। মিসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক সবল হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকে। যদি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যার দ্বারা চোয়াল ও মাড়িতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের রোগের কারণ হয় এবং এর দ্বারা হার্টের রোগও হয়ে থাকে।

মিসওয়াক এবং দাঁতের স্বাস্থ্য

মানুষ খানা খায়, পানি পান করে এবং বহু রকমের জিনিস খেয়ে থাকে। আর খানার ছোট ছোট কণা দাঁতের মাঝে জমতে থাকে। যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করার দ্বারা বের হয় না। এর দ্বারা দাঁতের মধ্যে দুর্গন্ধ জমা হয়ে থাকে, যা বহু রোগের পথ সুগম করে। উল্লেখ্য যে, এভাবে লোকের দাঁত ময়লাযুক্ত হলে খারাপ গন্ধ আসতে থাকে। নিকটে উপবেশনকারী ব্যক্তি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতের সাথে মাড়িও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাড়িতে পুঁজ জমা হয়, যার দ্বারা অসহ্য রকমের ব্যথা শুরু হয়। এর প্রভাব শুধু দাঁতের ওপরই পড়ে না বরং এই সমস্যা এবং পুঁজ আরো বড় হয়ে মাড়িও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্যা আরো বড় হয়ে গলায়ও প্রভাব ফেলে থাকে। এর প্রভাবে গলা খারাপ হতে থাকে এবং সাথে সাথে সর্দি-কাশি, সর্দি-জ্বর ইত্যাদির প্রকোপ বেড়ে যায়। বুকের ছাতির ওপর কফ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। যার দ্বারা মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয়। এর প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি কমজোর হয়ে যায়। যখন চোখ খারাপ হয়ে যায় তখন এই পুঁজ এবং সমস্যার কারণে কান ও পাকস্থলীও প্রভাবিত হয়। এমনকি এসব জীবাণু দেহের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ঐ দাঁতগুলো মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না করাতে মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। জীবন তো স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নাম। জীবনে যদি সুস্থতাই না থাকে তাহলে জিন্দেগীর মূল্য কোথায়? বৎস! মিসওয়াক ছাড়া উপায় নেই এবং মিসওয়াক ব্যতীত কখনোই পুঁজ, দূষণ ও কঠিন জীবাণু কখনো দূর হতে পারে না।

মিসওয়াক ও গলা

যে সকল রোগীর গলা খারাপ হয়, তারা টনসিলের রোগী। এ সকল রোগী নিয়ম মাফিক মিসওয়াক ব্যবহার করলে সুস্থ হয়ে যায়, এরূপভাবে যদি কোনো রোগীর গলার নালী বড় হয়ে যায় তাহলে তিনি শাহতুত এর শরবত এবং নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক করলে আরাম পেয়ে থাকেন।

মিসওয়াক ও মুখের ফোঁড়া

অনেক সময় মুখের মধ্যে গর্মি, দুর্গন্ধ, এবং অদৃশ্য জীবাণুর কারণে ফোঁড়া হয়ে যায়। এ সকল ফোঁড়ার মধ্যে এমন কিছু ফোঁড়াও আছে যেগুলো বের হয়ে আসে আবার কখনো গোপন হয়ে থাকে। ইহা খুবই কষ্ট ও ক্ষতিকর হয়। এ জীবানুগুলো পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে, পুরো মুখকে নিজের আক্রান্ত স্থলে পরিণত করে। যার কারণে খাবার গ্রহণ করা মুশকিল ও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং রোগী ক্ষুধার কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যদি মুখে প্রতিদিন নিয়মিত তাজা মিসওয়াক করা হয়, এর লালা উত্তমরূপে মুখে মিলে যায় ফলে এ রোগ হয় না আর যদি হয়ও তাহলে নিয়ম মাফিক মিসওয়াক করার দ্বারা রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও দৃষ্টিশক্তি

চোখের রোগ ও দৃষ্টির রোগের মধ্যে দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা বড় ধরনের স্থান দখল করে আছে। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাবারের কর্নার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। যার ফলে চোখের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে এবং এভাবে এতে যদি দাঁতের দুগর্ন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ব্যক্তি চোখের জ্যোতি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। কম দৃষ্টিশক্তির রোগীদের অনেকে এমন রোগী হয়ে থাকে যার রোগ অন্যান্য অনেক কারণের সাথে দাঁতের ব্যাপারে তাদের গাফলতি সবচেয়ে বড় কারণ হয়।

মিসওয়াক ও কান

কিছু এমন রোগীও হয় যারা কানের প্রদাহ, পুঁজ এবং ব্যথায় কাতর থাকে। মাসের পর মাস চিকিৎসা করালেও তাদের এ কষ্ট থেকে মুক্তি মেলে না। যখন

উত্তমরূপে এ সকল রোগীদের পরীক্ষা করা হয়, তাহলে জানা যায় যে এদের মাড়িতে পুঁজ হয়ে গেছে এবং এর পুরা মুখ দুর্গন্ধে ভরপুর। যখন মাঁড়ির চিকিৎসা করা হয় এবং নিয়মমত তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা হয় তখন কানও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও পাকস্থলী

বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রায় ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের সমস্যা সংশ্লিষ্ট রোগ। বিশেষত বর্তমানে প্রতি তৃতীয় ব্যক্তি (তিনজনে একজন) পেটের রোগে আক্রান্ত।

মিসওয়াক না করার কারণে মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়, যে কারণে মাড়িতে পুঁজ জমা হয় এবং কিছু অদৃশ্য জীবাণুও মুখে সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খাদ্যের সাথে মাড়ির পুঁজও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যার কারণে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়ে যায়। মাড়ির পুঁজের কারণে ভক্ষিত অংশ ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যে কারণে পাকস্থলী ও জঠরের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা মুশকিল হয়ে যায়। যদি জঠর ও পাস্থলীর রোগের চিকিৎসার পরে দাঁতের দিকে মনোযোগ দেয়া যায় অর্থাৎ নিয়মিত মিসওয়াক করা যায় তাহলে রোগের দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যায়।

মিসওয়াক এবং সার্বক্ষণিক কফ কাশি

সার্বক্ষণিক কফ-কাশি এমন এক রোগি যার কফ আটকে গেছে, যখন সে মিসওয়াক করে তখন ঐ কফ ভিতর থেকে বের হওয়া শুরু হয় এবং এ রোগীর মাথা হাল্কা হয়ে যায়।

প্যাথলজিস্ট বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, সার্বক্ষণিক সর্দির জন্য মিসওয়াক প্রতিশেধকের চেয়ে কম নয়। এমনকি মিসওয়াকের স্বতন্ত্র ও বিধিমত ব্যবহারে নাক ও গলার অপারেশন অনেক কমে যায়।

মিসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ

এক লোকের মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসত। এ বেচারা বিভিন্ন প্রকারের ভালো ভালো টুথ পেস্ট এবং মিনজান ব্যবহার করেন এ ছাড়াও অনেক ডাক্তারের থেকে অনেক ওষুধও ব্যবহার করেছেন; কিন্তু কোনো উপকার হয় নি।

কোনো একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তিনি পিলুর ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। পুরাতন লোম ফেলে প্রত্যহ নতুন মাথা দ্বারা মিসওয়াক করতে থাকেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই সুন্নতের বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

মিসওয়াক ও গুরু নানক

গুরু নানক-এর ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তিনি নিজ হাতে মিসওয়াক রেখে দিতেন। তিনি এর দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং বলতেন ওহে এই লাকাড় নাও, ইহা সকল রোগ নিয়ে নিবে।"

বড়ই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কথা এই যে, যদি মিসওয়াক নিয়ে ব্যবহার করো, তাহলে রোগ যেতে থাকবে এবং যদি এ ব্যাপারে অসলতা কর তাহলে অসুস্থ হয়ে যাবে।

মিসওয়াক এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রোগ

একলোকের গলা, ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছিল, এবং এ সাথে ঘাড় ফুলা ছিল। আওয়াজও ছোট হয়ে আসছিল মেধাশক্তিও কমছিল, এর সাথে মাথাও ঘুরছিল। এ ব্যক্তি মেধাবিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু সবই ফলহীন প্রমাণিত হলো। কারো পরামর্শে তিনি নিয়মমাফিক মিসওয়াক করতে থাকলেন। এভাবে যে, মিসওয়াককে দু'টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করেন এবং এ পানি দ্বারা গড় গড় করতেন। এছাড়াও যেখানে ফুলা ছিল সেখানে কিছু ওষুধের প্রলেপও দিয়েছেন। এ চিকিৎসা বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। একে বিশ্লেষণ করা হলে জানা যায় তার থাইরয়েড গ্লাণ্ড ইনফেক্টেও ছিল। যার প্রভাব সারা দেহের ওপর পড়েছিল। এই মিসওয়াক এর চিকিৎসা দ্বারা তার এ রোগ দূর হয়ে যায় এবং তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মিসওয়াক ও হার্টের পুঁজযুক্ত ঝিল্লি

হাকীম "এস. এম. ইকবাল" আখবারে জাহান পত্রিকায় লিখেন ঃ এক রোগীর হার্টের ঝিল্লিতে পুঁজ ছিল। সে চিকিৎসা করাচ্ছিল; কিন্তু কোনো উপকার হচ্ছিল না সর্বশেষে হার্টের অপারেশন করে পুঁজ বের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুঁজ আবার ভরে গেল। সকল দিক থেকে হতাশ হয়ে ঐ রোগী আমার নিকট আসলো। আমি তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তার মাড়ি খারাপ এবং তার মধ্যেও পুঁজ

আছে এবং এই পুঁজ হার্টের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এ পরীক্ষা ডাক্তারগণ গ্রহণ করে নিলেন। হার্টের অপারেশনের পরিবর্তে এর দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং তাকে পিলুর মিসওয়াক করতে বলা হলো– যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করেন।

টুথ ব্রাশ

পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত যে, যে টুথ ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে জীবাণুর স্তূপ জমা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হওয়ার আশু আশঙ্কা রয়েছে। পানি দ্বারা পরিষ্কার করার দ্বারা ঐ জীবাণু পরিষ্কার হয় না এবং তার বৃদ্ধি চলতে থাকে। এছাড়াও ব্রাশ-এর ব্যবহারে দাঁতের ওপরের ঔজ্জ্বল্য এবং সাদা আবরণ উঠে যায়। এর কারণে দাঁতের মাঝের ফাঁকাও বেড়ে যায় এবং দাঁতের মাড়ির স্থান ছুটে যেতে থাকে। এ কারণে খাদ্যের যে অংশগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে তা দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয় এবং অবশেষে সারা দেহে রোগের কারণ হয়ে যায়। এ কারণে এ সকল বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর আমল করা দরকার। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা মিসওয়াক করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

মিসওয়াক -এর প্রকারভেদ

মিসওয়াক-এর জন্য ঐ সকল গাছের ডাল উপযুক্ত যার আশ নরম হয়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মাড়ির ক্ষতি না হয়। সর্বোত্তম এবং উন্নতমানের মিসওয়াক নিম্ন লিখিত জাতের হয়ে থাকে।

১. পিলু ২. নিম ৩. বাবলা ৪. কানীর

১. পিলু ঃ পিলুর মিসওয়াক উপহারের সমতুল্য, যা রাসূল ﷺ-এর সুন্নত। সাহাবী হযরত আবু খাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি ঐ দলের মধ্যে ছিলাম যারা রাসূল ﷺ -এর খিদমতে হাজির ছিল। রাসূল ﷺ আমাদের পিলু গাছের লাকড়ি মিসওয়াক করার জন্য আমাদের পাথেয়র মধ্যে দিলেন।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খ-২, পৃ-২৬৮)

পিলুর মিসওয়াক নরম আঁশযুক্ত হয়, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। বেশির ভাগ অনুর্বর, ঊষর, বিরান ও জঙ্গলে হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, বিভিন্ন জিনিস যা মস্তিষ্কের খোরাক ও সহযোগী এবং এর মধ্যে একটা ফসফরাসও বটে। পিলুর মিসওয়াকে বিদ্যমান

ফসফরাস লালা এবং লোম কূপের মাধ্যমে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছায় যার দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয়।

২. নিম এবং বাবলা

নিম গাছের মিসওয়াকও অনেক উপকারী। এতে দাঁতের সামগ্রিক রোগসমূহের চিকিৎসা রয়েছে। এ গাছ সাধারণভাবে পাঞ্জাবে পাওয়া যায়, এরপর হলো বাবলার. মিসওয়াকের মর্যাদা। এর দ্বারা দাঁত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং ইহা দাঁতকে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ থেকে রক্ষা করে।

মনে রাখতে হবে সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত মিসওয়াক তাজা হওয়া দরকার। যদি প্রথমে শক্ত জাতীয় মিসওয়াক ব্যবহার করতে হয় তাহলে কঠিন আঁশগুলো কেটে দিন এবং দাঁতের দ্বারা নতুন মাথা চিবিয়ে আঁশ বানিয়ে নিন।

৩. কানীর

কানীর দুপ্রকারের হয়ে যাকে। সাদা ফুলবিশিষ্ট এবং লাল ফুলবিশিষ্ট। এ জাতের গাছ বেশরিভাগ পার্ক, উদ্যান ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। এর মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা দাঁতের সকল কষ্ট, পাইরিয়া ইত্যাদি শেষ হয়ে যায় এবং দুরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে যায়। এ মিসওয়াক ঝাঁজালো হয়ে থাকে কিন্তু এর এই ঝাঁজ দাঁতের জন্য সীমাহীন উপকারী। ডাক্তারগণ এর চাপ এর মধ্যে মওজুদ অণুগুলোকে দাঁতের ঔজ্জ্বল্য, মজবুতী এবং পাইরিয়ার মতো রোগের জন্য খুবই উপকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে এর সাথে তার ব্যবহারের জন্য ঐ জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন যা এর (মানুষের) স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তার বিশেষ বান্দাগণ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে এ সকল জিনিসের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। এ সকল জিনিসের মধ্যে মিসওয়াক এমন যা সকল নবীর সুন্নত এবং অধিকাংশ রোগের নিরাময়।

৭. অজু, ইসলাম ও মানবস্বাস্থ্য

পবিত্রতা শিক্ষা

ইসলাম যেখানে মুসলমানদের আত্মিক পবিত্রতার নির্দেশ দেন সেখানে তার শিক্ষা মুসলমানদের শরীর ও পোশাক-এর পবিত্রতারও শিক্ষা দেয়, যদি ইসলামের

পবিত্রতার পন্থার ওপর চিন্তা করা যায়, তাহলে এর পন্থা বিজ্ঞানের মাপকাঠির পথের চেয়েও উচ্চতর এবং উন্নততর বলে পরিলক্ষিত হয়। নামাযের পূর্বে অজুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা আত্মিক ও দৈহিক উভয় উপকারিতার সহায়ক। এ কারণে স্বয়ং অজুকে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়।

অজু করার তরীকা

এক স্থানে একজন অমুসলিম বিজ্ঞানী এক মুসলমানকে অজু করতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, কব্জি থেকে কনুই অংশ ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানিকে নিচ থেকে নয় বরং কনুই থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি এ পন্থা দেখে বড়ই প্রভাবিত হলেন। এরপর তিনি মাথা ও ঘাড়ের ওপর মাসেহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, মাথা ও ঘাড় ধোয়া হলো না, যাতে উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মাথা ও ঘাড় না ধুয়ে হাত বুলালেন (মাসেহ করলেন) যাতে প্রশান্তি ছাড়াও শিরার মধ্যে কম্পনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ধোয়ার দ্বারা হয় না।

যেহেতু কোমর ও ঘাড়ের সম্পর্ক শ্লেষার উৎস স্থলের সঙ্গে এবং মস্তিষ্ক, শিরার কার্যাবলিতে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ পদ্ধতিকে দেখে (সেই অমুসলিম বিজ্ঞানী) এমনই প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের সামনে নিজ শির নত করে দিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ১৩০০ বছর পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব নামাজের পূর্বে পবিত্রতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন তিনি নবী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

অজুর মহান দৈহিক উপকারিতা

প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ আলমগীর খাঁ এবং আর সি.পি জীবাণু থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অজুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"অজু স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলনীতির একটি। ইহা জীবাণুর বিরুদ্ধে এক অতি বড় ঢাল। যে সকল জীবাণুর কারণে বহু রোগ জন্ম লাভ করে থাকে। এসকল জীবাণু আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বায়ু, জমীন এবং আমাদের ব্যবহৃত সকল জিনিসের ওপর এ কষ্টদায়ক (জীবাণু) প্রভাব বিস্তার করে আছে।

মানবদেহ একটি দুর্গের ন্যায়। ছিদ্র পথ অথবা জখমের স্থান ছাড়া এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নাক মুখের ছিদ্রগুলো সর্বদা জীবাণুর আক্রমণের মধ্যে আছে এবং আমাদের হাতগুলোর এ সকল জীবাণুকে ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে (আত্মঘাতী) সাহায্য করে থাকে। অজুর মাধ্যমে আমরা শুধু এ সকল ছিদ্রের মধ্যেই

নয় বরং আমাদের দেহের ঐ সকল অংশের দিনে কয়েকবার ধৌত করা হয়, যা কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং সহজে জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে, এজন্য অজু আমাদেরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করার উত্তম এক মাধ্যম।"

অজু এবং মানবদেহ

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (যিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়ে "চিকিৎসা ও আঘাত" বিভাগের প্রধান এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনীয়াত-এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন) অজুর দৈহিক উপকারিতার বিষয়ে লিখেছেন ঃ

"অজুর দ্বারা মানুষের ঐ সকল অঙ্গ যা খোলা থাকে যেমন– হাত, মুখ, নাক, চোখ, চেহারা ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এ সকল অঙ্গগুলো সকল সময় খোলা থাকায় এবং এগুলোর দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধ ও নোংরা জিনিসের সাথে মিলে থাকে এবং বেশিরভাগ সক্রিয় রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। অজুর মাধ্যমে এ সকল আবর্জনা ধৌত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। অজুর আরও উপকারিতা এই যে, ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে যে অবসাদগ্রস্ততা, ক্লান্তি মানব প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় পতা অজুর পরে দূর হয়ে যায়। মানুষের মন-মগজে সতেজতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্য যে অজু শিরার কেন্দ্রগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে। (ইসলামের স্বাস্থ্যগত মূলনীতি, পৃ-৩১, ডা. সাইয়্যেদ হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী, প্রকাশক হাইয়া আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড় ভারত)।

অজুর উপকারিতা

তুরস্কের ডাক্তার ডডহুলুক নূর বাকী' "অজু স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম" -এর অধীনে অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি (Blood circulatory system)-এর ওপর অজুর প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর লিমপাটিক সিসটেম Lymphatic System)-এর ওপর অজুর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন যা নানা প্রকারের রোগ ব্যাধি থেকে সুরক্ষার নিয়ম। সর্বশেষে অজু এবং শারীরিক বৈদ্যুতিক স্থিতি-এর ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোচনা করেছেন। (A Static electricity of the body)

ডাক্তার নূর বাকী-এর দৃষ্টিতে যে পদ্ধতিতে অজু করা হয় এর উদ্দেশ্য দেহের মধ্যেকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর কয়েকটি দিক হলো–

১. দেহকে সংরক্ষণের জন্য লিমফটিক ব্যবস্থা Lymphatic System)-এর সঠিক পদ্ধতিতে কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, দেহের কোনো ক্ষুদ্র অংশেরও নজর করা যায় না, অজু এ কাজের দায়িত্ব বহন করে।

২. দেহের মধ্যেকার সংরক্ষণের নিয়ম এর নড়া-চড়া করার জন্য কেন্দ্রস্থল এ স্থান যা নাকের পিছনে নাসারন্ধ্রের মধ্যে হয়ে থাকে এবং এ সকল স্থান ধৌত করা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

৩. ঘাড়ের দুপাশে অজুর দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করার লিম্ফটিকা পদ্ধতি (Lymphatic Systam) এর "ক্রুয়ে কার্লানের" মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অজুর পানি প্রবাহ

একজন নামকরা জার্মানি গুণী ও প্রাচ্যবিদ "জাওয়াকীম ডী যুলফ "স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের শিক্ষার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার পরে এ সত্যকে স্বীকার করে তিনি লিখেন–

গোসল দ্বারা সারা দেহ এবং অজুর দ্বারা এর অঙ্গগুলো পাক করা জরুরি যা সাধারণ কাজকর্ম অথবা চলা-ফেরার মধ্যে খোলা থাকে। মুখ পরিষ্কার করা মিসওয়াক করা, নাকের ভিতরকার ময়লা-আবর্জনা দূর করা এ সকলই স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ আবশ্যকগুলোর বড় শর্ত হলো পানি প্রবাহের ব্যবহার, যা বাস্তবে জীবাণুর অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করে।

অজু ও গোসল

ইসলামে শারীরিক পবিত্রতার ওপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে অজুকে আবশ্যক ও ফরজ করা হয়েছে। এরূপভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনের পরে স্বামী-স্ত্রীর গোসল করা এবং হায়েজ নেফাসের পর মহিলাদের গোসল করা অত্যাবশ্যক। এর কারণ এই যে, বীর্যের বস্তুগুলো এবং হায়েজ নেফাসের দুর্গন্ধময় রক্ত জীবাণুর বাহন। এজন্য আবশ্যক যে, এ নাপাকীগুলো দেহ থেকে পূর্ণরূপে দূর করা যাতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিস তারপর প্রতিপালিত হয়ে বহুসংখ্যক হয়ে দেহকে কোনো রোগে আক্রান্ত না করতে পারে। এছাড়াও শরীরকে পানি দ্বারা ধৌত করায় তার সুপ্রভাব আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাও গোপন নয়, তবে এখানে শুধুমাত্র দেহকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার বিষয় আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

যদি এশার সালাত আদায় করার পরে মানুষ ঘরোয়া কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় অথবা এভাবে বেকার বসে থাকে এবং তার অজু চলে যায় তাহলে উত্তম হলো যে, সে অজু করে শোবে। কেননা অজু করে শোয়াতে পূর্ণ প্রশান্তি এবং গাঢ় ঘুম আসবে এবং শরীরও পূর্ণভাবে জীবাণু থেকে পবিত্র হবে।

যদি হাতগুলোতে জীবাণু ইত্যাদি থাকে তাহলে ঘুমের মধ্যে তাা সহজে মুখ; নাকের রাস্তায় দেহে প্রবেশ করে। এছাড়াও যদি খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে শোয়ে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু এবং যাবতীয় পোকা আঙ্গুলের ফাঁক এবং খাবার কণার ওপর আক্রমণ করে থাকে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

যে ব্যক্তি রাতে এ অবস্থায় শোয় যে, তার হাতে খাদ্যের কণা ছিল, এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হলে সে নিজেকে যেন খারাপ বলে যে, তার অলসতার কারণে এরূপ হয়েছে।"

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার পূর্বে নিয়মমাফিক অজু করতেন। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

"যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা কর, তখন অজু কর, যেভাবে নামাযের জন্য অজু করা হয়।" (ছহীহুল বুখারী, অজু অধ্যায়, হাদীস নং ২৪২)

ডাক্তার ইমতিয়াজ লিখেছেন, রসূল বলেন ও শোয়ার পূর্বে হাত, মুখ এবং অন্যান্য অংশ ধোয়া আবশ্যক। কেননা, দিন ভর মাটি, ময়লা, ধুলা ও জীবাণুগুলো ছিদ্রে জমা হয়ে চামড়াকে দূষিত করে থাকে। মুখ ধোয়ার দ্বারা চোখের মধ্যে জমা হওয়া ধুলাবালিও পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈহিক পবিত্রতার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

"প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক আছে যে, সে সপ্তাহে অন্তত এক দিন গোসল করবে এবং নিজের মাথা ও দেহকে ধৌত করবে।"

এক ঘটনায় বিশ্ব সম্রাট (নবী স.) স্বয়ং এরশাদ করেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে কোনো খানাপিনার জিনিসে হাত লাগানোর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার নিজেদের হাত ধোবে।"

দেহকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। পরিষ্কার কাপড় পরবে এবং গোসল করবে– এগুলো পরিচ্ছন্নতার অংশ। এ সকল পদক্ষেপ দেহের ওপর থাকা সকল

সময়ের জীবাণু এবং অন্যান্য জীবাণুকে ধুয়ে প্রবাহিত করে এবং চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। যাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কমতি থাকে তাদের এসকল জীবাণু সংক্রমিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগের সৃষ্টি করে এবং চর্মের বদৌলতে দেহের বাকী অঙ্গগুলো যেমন– হাড়, পিঠ এবং জোড়া ইত্যাদির ওপর প্রভাব ফেলে। এ সকল রোগ থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে বিচিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হলো যে, বার বার গোসল করতে হবে এবং দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যদ্দ্বারা চর্মের ওপরে থাকা জীবাণু ধোয়ে যায় এবং মানুষের চর্ম ও দেহ এ জীবাণুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

মুসলমান পুরুষ ও নারীদের ওপর কয়েক অবস্থায় গোসল ফরজ হয়ে যায়, (কোন কোন কারণে গোসল ফরজ হয়-এর বর্ণনা ফিকহর কিতাবগুলো যেমন– বাহারে শরীআত, কানুনে শরীআত, নূরুল ইজাহ, কুদুরী, আসান ফিকাহ, কানযুদ দাকায়িক হেদায়া, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে দেখুন।)

জানাবতের অবস্থায় গোসল করার মধ্যেও অনেক হেকমত রয়েছে ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান সাক্ষী যে, জানাবাতের অবস্থায় ঘামও ঘন হয়ে যায় এবং ঘামের সাথে মিশে যে ময়লা দেহের ওপর জমে যায়, তাকে যদি ঘষে ঘষে পরিষ্কার না করা হয় তা হলে তা খোস পাঁচড়ার উপযোগী হয়। নিয়মিত গোসলকারী এরূপ চর্মরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। রোগের প্রতিরোধ ছাড়াও গোসলের এক বড় উপকার এই যে, গোসলের দ্বারা শরীরে সতেজতা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। খারাপ চিন্তা-ভাবনা থেকে মনমগজ মুক্তি পায় এবং অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি এবং ফরজ আদায় করার জন্য মনের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ অনুভব করা যায়। যার দ্বারা দেহ সুস্থ থাকে।

স্বনামধন্য জার্মান প্রাচ্যবিদ "জাওয়াকীম ডী যুলফ" লিখেন ঃ গোসল ও অজুর কর্তব্যগুলো একান্তই কল্যাণ ও উপকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (ছালিহুল আকলিয়াহ লিআহকামিন্ নাকলিয়াহ পৃ. ৪০৬।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নামাজ ফরজ করেছেন এবং এর জন্য অজুকেও ফরজ করেছেন। অজু ব্যতীত নামাজ হয় না। যদি অজুর আমলের ওপর চিন্তা করি তাহলে এর মধ্যেও হেকমাত নিহিত রয়েছে। বারবার মুখ, হাত ও পা ধোয়ার দ্বারা, কুলি করার দ্বারা, নাকে পানি দেয়ায়, সকল অংশের ওপর থাকা জীবাণু চলে যায়, এভাবে নামাজী বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।"

বর্ণিত গবেষণার কারণে কেউ এ কথা বলে না যে, অজু ও গোসলের মানবিক উদ্দেশ্য দেহকে সুরক্ষিত করার বিধানকে শক্তি দেয় না। তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর

বাকী" অজু সুন্দর স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র"-তে একথা প্রকাশ করেছেন যে, "তাঁর দৃষ্টিতে চেহারার সৌন্দর্য এবং চর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অজু একটি ঢাল। তাঁর মতে "প্রশান্তির বিদ্যুত" সবচে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব চামড়ার নিচের ছোট ছোট পিঠের পর এর ধারাবাহিকতায় পড়ে যে, অবশেষে এ কাজ করা ছেড়ে দিতে হয়। এ কারণে যে, সময়ের শুরুতে চিড় ধরা শুরু হয় এবং এটা চেহারা থেকে আরম্ভ হয়। এ আমল সারা দেহের ওপরও প্রভাব ফেলে থাকে।

অনেক লোক এ সকল লোকদের উজ্জ্বল চেহারার গোপন তথ্য জানার পর নিজের জীবনে অজু করার অভ্যাস গড়েছেন। যে কেউ অজুর অভ্যাস রাখে সে নিশ্চিতই স্বাস্থ্যবান এবং অবশেষে অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী চামড়ার মালিক হন। আমাদের সময়ে এ এক মুজিযা যে, যখন সৌন্দর্যের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হচ্ছে অথচ এর দশগুণ অধিক খরচের দ্বারাও অজুর বরকতের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ ফারুক কামাল এম. ফার্মেসী (লন্ডন ইউনিভার্সিটি) বিভিন্ন মানুষের অঙ্গের ওপর অজুর প্রভাব উল্লেখ করে লিখেন ঃ মানুষ যখন মুখ ধোয় তার দ্বারা চোখ ধৌত হয়, নাক পরিষ্কার হয় চেহারার চর্ম ধৌত হয়। যার কারণে চর্মের ওপর এক তেজোদীপ্ততা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং চর্মের প্রদাহ থেকে মানুষ রক্ষা পায়। কনুই পর্যন্ত হাত ও পা সুন্দরভাবে ধোয়ার দ্বারা মানুষ চর্মরোগের থেকে রক্ষা পায় এবং এ কাজ দ্বারা রক্ত যেখানে যেখানে পানি পৌঁছায় সেসব স্থানে পরিসঞ্চালন বেড়ে যায় । ময়লা আবর্জনা বের হওয়াতে চামড়ার রঙে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ চমক সৃষ্টি হয়। সকল নামাজের সঙ্গে মিসওয়াকেরও হুকুম আছে। এরও বহু প্রকারের উপকারিতা রয়েছে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। মাথা ও ঘাড় মাসেহ দ্বারা মানুষের হালকা পাতলা লেগে থাকা ময়লা ও ধুলোবালি দূর হয়। এ দ্বারা চুলের সৌন্দর্য বজায় থাকে। অজুর দৈহিক উপকারিতার সাথে সাথে আত্মিকভাবেও মানুষ অনেক প্রশান্তি অনুভব করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় এবং স্মরণ শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অজুর মধ্যে দেহের ঐ সকল অংশ ধোয়াকে আবশ্যক করা হয়েছে যা খোলা থাকে এবং ঐগুলোই জীবাণু প্রবেশের প্রধান প্রধান পথ।

ডাক্তার শাহেদ আতহার (ক্লিনিক্যাল এসোসিয়েট প্রফেসর অভ ইন্টারন্যাল মেডিসিন ইন্ডাইন্ড কৃনিলজী, ইউনিভার্সিটি আইডিয়াল স্কুল অভ মেডিসিন) অজুর ডাক্তারি উপকারিতা লিখতে গিয়ে লিখেন ঃ Washing all the exposed areas of the body, hand, feet, face, mouth, etc 5 times a day is a

healthy preventive procedure." (Health guidelines from Quran and Sunnah. P.—60)

শাহ আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দার মেডিকেল কলেজ এর সাথে যুক্ত ডাক্তার হাসান গজনবী তাঁর এক প্রবন্ধে (Islam and medicine নামে) অজু সম্পর্কে লিখেন ঃ "A Pre-requisite of prayers yet one of the most hygienic procedure as it usually keeps the exposed parts of our body clean and also the parts of entry like mouth and nose thus avoiding infection."

অর্থাৎ নামাযের পূর্বশর্ত অন্যতম সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি যা সাধারণত দেহের খোলা অংশগুলো পরিপূর্ণ রাখে এবং (জীবাণু) প্রবেশের পথগুলো যেমন– মুখ, নাক, এভাবে ইনফেকশন থেকে রক্ষা পায়।"

৮. অজুর ফযীলত

হাদীস নং– ১ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে একথা বলতে শুনেছি যে, "মুমিনের অলংকার কিয়ামতের দিন ঐ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যে পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছায়।" (সহীহ মুসলিম, অলংকার পৌঁছান অধ্যায় পৃ.– ৫৮৫)

হাদীস নং– ২ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامِ . غُرَّ الْمُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ .

"অবশ্যই আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় ডাকা হবে যে, তাদের অজুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে। এজন্য যে ব্যক্তি নিজ ঔজ্জ্বল্যকে বাড়াতে চায়, সে যেন তা বাড়ায়।"

হাদীস নং– ৩ ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ .

যে ব্যক্তি **অজু করল** এবং সুন্দরভাবে করল, তার গুনাহ দেহ থেকে বের হয়ে যায়, **এমনকি অজুকা**রীর গুনাহগুলো তার নখের নিচ থেকে বের হয়ে যেতে থাকে। (সহীহ **মুসলিম**, গুনাহ বের হওয়া অধ্যায়, পৃ-৫৭৮)

হাদীস নং- ৪ ঃ আমীরুল মুমিনীন ও খালীফাতুল মুসলিমীন সাইয়েদুনা হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর ﷺ এরশাদ করেন ঃ

لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوَضُوْءَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ ـ

যে কেউ পূর্ণ অজু করে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ-১, আরবী পৃ.-৫৪২)

হাদীস নং-৫ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَوَضَّاَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَ الْوَضُوْ الَّتِىْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّاَ اثْنَتَيْنِ فَلَهٗ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وَضُوِىْ وَوَضُوْ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِى ـ

অর্থাৎ যে অজু করার সময় সকল অঙ্গ একবার ধৌত করে, ইহা ফরজের মর্যাদা পায়, এ ছাড়া অজুই হয় না। আর যে ব্যক্তি অজুর মধ্যে সকল অঙ্গ দুবার ধৌত করে তার দ্বিগুণ প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি অজুর মধ্যে অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধৌত করে তবে ইহা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু।" (মুসনাদে আহমদ, খ-২ আরবী পৃ. ৯৮)

হাদীস নং- ৬ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের ইচ্ছায় অজু করার জন্য ওঠে, অতঃপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে, তাহলে তার হাতের গুনাহ প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়, অতঃপর যখন কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে, তাহলে তার জিহ্বা এবং গিরাগুলোর গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন চেহারা ধৌত করে, তখন স্বীয় গুনাহগুলো থেকে এরূপভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন আজই তার মাতা তাঁকে জন্ম দিলেন। অতঃপর যখন নামাজ পড়ার জন্য খাড়া হয়,

তখন আল্লাহ তায়ালা এ নামাজের কারণে এর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। যদি (শুধু) বসেও থাকে, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে বসে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, খ.-৫, আরবী পৃ.-২৬)

হাদীস নং–৭ ঃ হযরত খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, অতঃপর أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়, তাতে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, অযুর পরে মুস্তাহাব দুয়া অধ্যায়, পৃ.–৫৫৩)

হাদীস নং–৮ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

"যে ব্যক্তি অজু করার পর বলে, "ওহে প্রভু! পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমারই নিকট ফিরে আসি।" তাহলে এ দুয়াগুলো এক কাগজে লিখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত ছিঁড়বে না (বরং এর উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হবে।) (ওয়াকিফাতুজ জাহাবী, খ-১, আরবী, পৃ. ৫৬৩)

অজু করার ত্বরীকা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা অজুর বিষয় উল্লেখ করে স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং মাসেহ কর তোমাদের মাথা (অংশ বিশেষ) এবং ধৌত কর তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত।" (৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৬)

অজুর ফরয

অজুর ফরয চারটি, যথা– যা উল্লিখিত পবিত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ফরয ঃ মুখমণ্ডল, অর্থাৎ কপাল থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত এ পরিমাণ ধোয়া যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে।

দ্বিতীয় ফরজ ঃ বাহুদ্বয় কনুই পর্যন্ত এভাবে ধোয়া যাতে কোনো স্থান শুষ্ক না থাকে।

তৃতীয় ফরজ ঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা,

চতুর্থ ফরজ ঃ টাখনুসহ পা ধোয়া যেন কোনো স্থান পানি প্রবাহ থেকে খালি না থাকে।

অজুর সময় এই চার ফরজের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক অন্যথা সর্ব সম্মতিক্রমে অজু শুদ্ধ হবে না।

অজুর সুন্নাত

১. অজুর নিয়ত করা।

২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. তিনবার হাতগুলোকে কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৫. তিনবার কুলি করা এবং দাঁতের ওপর আঙ্গুল মিলানো।

৬. তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

৭. তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া

৮. তিনবার কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।

৯. প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করা।

১০. পুরো মাথা মাসেহ করা।

১১. কান মাসেহ করা।

১২. ঘাড় মাসেহ করা (মুস্তাহাব)

১৩. দু পা তিন বার করে ধোয়া।

১৪. প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা ধোয়া।

১৫. দাড়ি খেলাল করা।

১৬. হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

১৭. অঙ্গগুলোকে ডলে ডলে গুরুত্বসহ ধোয়া।

১৮. ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে ধৌত করা।

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অজু

আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান গনী (রা) অজুর পানি চাইলেন এবং অজু করলেন, তিন তিন বার নিজ হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করলেন, এরপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন, এরপর তিনবার নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এরপর তিনবার কনুইসহ স্বীয় ডান বাম হাত ধৌত করলেন এরপর তার মাথা মাসেহ করলেন, এরপর তিনবার টাখনুসহ ডান পা ধৌত করলেন, এরপর কনুইসহ তিনবার বাম পা ধৌত করলেন, এরপর উসমান গনী (রা) ইরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ অজু করতে দেখেছি ঃ (মুসলিম সালাতের গুণাবলি অধ্যায় খ-১, আরবী-১২০)

অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা

এখন অজুর ধারা অনুযায়ী অজুর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করব।

হাত ধোয়া

যখন অজু শুরু করা হয় তখন সর্ব প্রথম দুহাত তিনবার ধোয়া হয়, এরূপ করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। হাদীস শরীফে এরূপ কাজকে গুনাহ থেকে পাক করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ -

যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে।" (সুনানে নাসায়ী ঃ মাথাসহ দুই কান মাসেহ অধ্যায় ঃ ১০৩ নম্বর)

যেহেতু হাত ধোয়ার দ্বারা মানবদেহে প্রচুর পরিমাণে উপকার সাধিত হয়, এর কয়েকটি আলোচনা করা হল ঃ

আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরে থাকি, যেহেতু হাত খোলা থাকে, এতে হাতের ওপর বিভিন্ন রোগের জীবাণু বা বিভিন্ন কেমিক্যাল (Chemicals) মওজুদ থাকে যা আমাদের হাতকে কলুষিত করে। যদি হাত না ধুয়ে কুলি করা হয় বা নাকে পানি দেয়া হয় তাহলে এ সকল জীবাণু সহজেই আমাদের মুখ বা নাকের মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহকে নানা প্রকারের রোগে আক্রান্ত করে। এজন্য হাত ধোয়ার ওপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার অধ্যাপক ডাক্তার শাহেদ আতহার এম.ডি লিখেছেন–

"Hand woshing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However Non-Moslim did not know that hand washing is so important has been ordred in the Quran 1400 yeas ago" (Health Guidelines from Quran and Sunnah. P. 60)

"বর্তমানে হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। অমুসলিমগণ জানেন না যে, হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আল কুরআনে সেই ১৪০০ বছর পূর্বে।"

খাজা শামসুদ্দিন আজিমী লিখেছেন' "যখন আমরা অজু করি তখন আঙ্গুলের ফাঁকগুলো থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন বৃত্ত তৈরি করে যে, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূরীকরণের বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলার শক্তি বেড়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক সীমা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঝলক দেয়। এ কাজের দ্বারা হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সঠিক পদ্ধতিতে অজু করার দ্বারা আঙ্গুলের মধ্যে এমন লাবণ্য তৈরি হয়, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা সীটের ওপর পরিবর্তন করার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়ে যায়।"

কুলি করা

অজুর সময়ে তিনবার কুলি করা সুন্নত। এর দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ -

যখন মুমিন বান্দা অজু করার সময় কুলি করে, তখন তার মুখের সকল গুনাহ ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবী পৃ. ২৬৩) (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

কুলির দ্বারা দাঁতের মধ্যকার খানার ঢুকে থাকা কণা মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যদি দাঁতের অভ্যন্তর থেকে এ সকল কণা বের না করা যায় তাহলে এগুলো দাঁত, মস্তিষ্ক এবং গলার বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে যায়।

"কুলি করার দ্বারা যা মুখকে পরিষ্কার করে, তা দাঁতের রোগ থেকেও মুক্ত করে, চোয়াল মজবুত হয় এবং দাঁতের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, রুজি বেড়ে যায়, এবং মানুষ টনসিলের রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

নাকে পানি দেয়া

নাকে পানি দেয়াও দয়াল নবী ﷺ-এর সুন্নত। ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দিবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে। এভাবে হাদীস শরীফে নাক পরিষ্কার করারও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মুমিন যখন অজু করার সময় নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, তখন নাকের গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়।" (এ সকল গুনাহ বলতে ছগীরা গুনার কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ বিশেষভাবে তাওবা ও ফিরে আসার সিদ্ধান্তে মাফ হয়ে থাকে। – অনুবাদক) (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবী- পৃ. ২৬৩)

সুনানে নাসায়ী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

فَاِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ -

"মুমিন বান্দা অজু করার সময় যখন নাক ধোয়, তখন নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়।" (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

নাক ধোয়া এবং পরিষ্কার করার মধ্যে যেখানে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সেখানে চিকিৎসাগত উপকারিতাও অর্জিত হয়। কুলি করার পর নাকে পানি দেয়া হয়, নাক মানব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ দেয়ার যোগ্য অঙ্গ। নাকের উত্তম যোগ্যতা এই যে, আওয়াজকে অন্তরঙ্গ করে এবং সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আঙ্গুল নাকের ছিদ্রের নাসারন্ধ্রকে দাবিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে আপনার নিকট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। নাকের মধ্যেকার পর্দাগুলো আওয়াজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মস্তকের জ্যোতি একত্রিত করে। বিশেষ অংশগুলো পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাকের বড় ভূমিকা রয়েছে। নাক ফুসফুসের জন্য বায়ুকে পরিষ্কার, গরম এবং উপযুক্ত বানায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যহ প্রায় শত ঘনফুট বায়ু নাকের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে। বায়ুর এত বড় পরিমাণে একটি বড় কক্ষ ভরে যাবে। বরফের মওসুমে জমা এবং শুষ্ক দিনে আপনি বরফের ময়দানে স্কেটিং (Skating) শুরু করে দিন; কিন্তু আপনার ফুসফুস শুষ্ক হাওয়ার দ্বারা সমস্যায় পড়ে না। সে ইহার এক অযুতাংশও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যদিও এমতাবস্থায় তার এত বায়ুর প্রয়োজন হয় যা গরম ও আর্দ্র হাওয়ায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ৮০% আর্দ্র এবং ৯০° ফারেনহাইট উষ্ণ বায়ু চায়। ফুসফুস জীবাণু থেকে পবিত্র ধোয়া অর্থাৎ ধুলা ও ময়লামুক্ত বায়ু চায়। এরূপ পরিমাণ বায়ু জমাকৃত একটি এয়ার কন্ডিশন ছোট ট্রাংকের সমান হবে অথচ নাকের মধ্যে কুদরতের নিয়ম একে এমন সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত (Intagrated) করে দিয়েছেন যে সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা।

নাক বায়ুকে আর্দ্র করার জন্য $\frac{১}{৪}$ গ্যালন (এক চতুর্থাংশ গ্যালন) আর্দ্রতা প্রতিদিন তৈরি করে থাকে। পরিষ্কার এবং অন্যান্য শক্ত কাজ নাসারন্ধ্রের চুলগুলো করে থাকে। নাকের মধ্যে এক খাদক ঝাড়ু আছে। এ ঝাড়ুর মধ্যে অদৃশ্য শলাকা রয়েছে যা হাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছানো ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবাণুগুলো মেশিনের মতো ধরা ছাড়াও অদৃশ্য শলাগুলোতে এক প্রতিরোধী মাধ্যম রয়েছে যাকে ইংরেজিতে Lysonimun বলা হয়। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাক চোখগুলোকে Infection থেকে রক্ষা করে।

যখন কোনো নামাযী অজু করার সময় নাকের ভিতর পানি দেয় তখন পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক রশ্মি অদৃশ্য লোম-এর কার্যকরী শক্তি বাড়ায় যার ফলে মানুষ অসংখ্য অদৃশ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

মুখমণ্ডল ধোয়া

অজু করার সময় একবার চেহারা ধোয়া ফরজ এবং তিনবার ধোয়া নবী কারীম ﷺ-এর মুবারক সুন্নত। চেহারার সীমা মাথার চুলের গোড়া থেকে নিয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। হাদীস শরীফে চেহারা ধৌত করা রহমতের কারণ। এ সম্পর্কে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন–

فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ -

"অজুকারী যখন নিজ চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার গুনাহগুলো ঝরে যায় এমনকি গুনাহ পালকের শিকড় থেকেও বের হয়ে যায়।"

এরপরে হুজুর ﷺ আরো বর্ণনা করেন ঃ অজুকারী যখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধোয়, তখন সকল গুনাহ এবং অপরাধ এমনভাবে পাক হয়ে যায়, যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করল।" (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবী পৃ. ২৬৩)

মুখমণ্ডল ধোয়ার অনেক বেশি চিকিৎসাগত, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। নিচে কিছু বর্ণনা করা হলো ঃ

চেহারা ধোয়ার বড় হেকমত নিহিত রয়েছে যে, এর দ্বারা অবয়বে নম্রতা ও সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়। ময়লা ধুলার দ্বারা বন্ধ লোমকূপ খুলে যায়। চেহারা উজ্জ্বল, পূর্ণ আকর্ষণ ও ভীত হয়ে যায়। মুখ ধোয়ার সময় পানি যখন চোখের মধ্যে যায় তখন এর দ্বারা চক্ষুর অবয়বে শক্তি পৌঁছায়। গোলকের সাদা এবং মণির মধ্যে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। অজুকারীর চোখ পূর্ণ আকর্ষণীয় সুশ্রী ও নিদ্রালু হয়ে যায়। চেহারার ওপর তিনবার হাত বুলানোতে সীনা ও মস্তিষ্কের ওপর প্রশান্তি আসে।

আজকাল যখন আমরা ঘর থেকে বের হই এবং আমাদের চলাচল এমন স্থান দিয়ে হয় যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবাণু পাওয়া যায়। যেমন অনেক স্থানে ময়লা ধুলার বর্জ্য স্তূপ পড়ে রয়েছে অথবা প্রাণী বা মানুষের বর্জ্য খোলা পড়ে রয়েছে, কোথাও বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ যেমন নাড়ী ভুড়ি, রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ সকল স্থান জীবাণুর স্বর্গরাজ্য এবং যখন ইহা খোলা পড়ে থাকে তখন এর জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে এবং যখন মানুষ এ সকল স্থান অতিক্রম করে তখন এ সকল জীবাণু মানুষের হাত, চেহারার ওপর আক্রমণ করে এবং আমরা যখন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ বার আমাদের চেহারা ধৌত করি তখন এ সকল জীবাণু থেকে আমরা

বেঁচে থাকতে পারি যা চেহারায় পৌঁছানোর পর নাক-মুখের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ ঘটায়।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা ময়লা-আবর্জনা। শিল্পের উন্নতি আমাদেরকে এ কঠিন সমস্যার ব্যাপারে অধিক সজাগ করে। কারখানার চিমনি থেকে বের হওয়া গ্যাস এবং গাড়ির সাইলেন্সার থেকে বের হওয়া ধুয়া দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ আবহাওয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড ব্যতীত সালফার-ডাই-অক্সাইড মিশে যাচ্ছে। যদি এ সকল গ্যাস হাওয়ার মধ্যে বেশি বেশি থাকে এবং একজন মানুষের ঘামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে চেহারার ওপর থাকা ঘামের ফোঁটা এই গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস (কার্বন এসিড, সালফিউরিক এসিড) এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই ঘাম দ্বারা সৃষ্ট এসিড মানব চর্মকে খারাপ করে দেয়। এজন্য চেহারা ধোয়ার দ্বারা ঘাম এবং বিষাক্ত ক্যামিক্যাল ইত্যাদি ধুয়ে চলে যায় এবং মানুষ চর্মরোগ এবং চেহারার অ্যালার্জী থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

অজুর মাধ্যমে চেহারা ধোয়ার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে পারে। চোখের অসুখের সময় ডাক্তারগণ বার বার চোখ ধোয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হাকীম মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ চাগতাঈ-এর মতে অজু করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায় মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে তাহলে চোখের রোগ থেকে মানুষ বেঁচে যায় এবং যে সকল চোখে কাচে আর্দ্রতা কমে, তা শেষ হয়ে যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

দিনের মধ্যে বারবার অজুর জন্য চেহারা ধৌত করার কারণে এর সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লেডি বিচার এক আশ্চর্য ও চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার বক্তব্য হলো যে, মুসলমানদের কোনো প্রকারের কেমিক্যাল জাতীয় লোশনের প্রয়োজন নেই। তারা ইসলামী অজুর মাধ্যমে চেহারা ধুতে থাকে এবং মুসলমানগণ কয়েকটি রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

দাড়ি খিলাল করা

অজু করার সময় হালকা দাড়ি ধোয়া যায় এবং ঘন দাড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করে চুলগুলোকে ভিজানো হয়। ইহা নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত।

দাড়ি ধোয়া অথবা খিলাল করার দ্বারা চুলের গোড়া ভিজে যায় এবং সেগুলো মজবুত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। দাড়ি খিলাল করার দ্বারা সকল প্রকারের জীবাণু

(Common Germs) এবং (Contaglious Germs) ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। দাড়ির চুলে জমে থাকা পানি গলায় শক্তি যোগায়। এভাবে থাইরয়েড গ্লান্ড এবং গলার সকল রোগ থেকে বাঁচায়।

ইসলামের নবী ﷺ -এর সকল কথায় হেকমত ও কল্যাণ রয়েছে। অজু ও নামাজ-এর বিধানাবলী যা একাধারে প্রভুর সন্তুষ্টি ও আত্মিক উন্নতি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। ঐভাবে মানব দেহ এবং দুনিয়ার জীবন এর কয়েকটি সমস্যা থেকে বেঁচে যায়।

আজ দুনিয়ার মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের জীবনে কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতার নিশ্চয়তা একমাত্র এবং একমাত্র ইসলামের বিধানের ওপর আমল করা, অপর কোনো ধর্ম এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ঐ কারণে সকল ধর্ম বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

অজু করার সময় কনুইসহ হাত একবার ধোয়া ফরজ এবং তিনবার ধোয়া সুন্নত। মুমিন বান্দার এ ধরনের আমলকে রহমতের কারণও বানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ -

যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে।" (সুনানে নাসায়ী ঃ মাথাসহ দুই কান মাসেহ অধ্যায় ঃ ১০৩ নম্বর)

বাহুর এ অংশে বিভিন্ন প্রকারের রক্তনালী বা শিরা রয়েছে। এর মধ্যে শিরা (Arterie) এবং রগ (Veins) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেহের এ অংশ বিভিন্ন প্রকার রোগকে চিহ্নিত করার জন্য বড়ই সাহায্যকারী। এখান থেকে রগের অনুসন্ধান Pulse) এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। এ অংশগুলো ধোয়া এবং ম্যাসেজ করার দ্বারা মানবদেহের ওপর ধনাত্মক (উপকারী) প্রভাব পড়ে থাকে। পানি রক্তের উত্তাপকে কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure) কে কমিয়ে দেয়।

মাথা মাসেহ করা

এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা ফরজ এবং একবার পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নত। মুসলমানদের এক আমলকেও খারাপ কাজের কাফফারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ ـ

অযুকারী যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ ঝরতে থাকে এমনকি তার দুই কানের নিচ থেকেও।" (সুনানে নাসায়ী মাথা সহ কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

মাথা মাসেহ করার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক হেকমত পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞানবান বলতে জানেন যে, মাথার ওপরের চুল মানুষের এন্টেনার (Antenna) কাজ করে থাকে। এ কথা সকল অনুভূতিসম্পন্ন লোকই জানে যে, মানুষ তথ্যের গুদামের নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো কাজের ব্যাপারে খবর না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না।

যেমন খানা আমরা তখন খাই যখন ক্ষুধা লাগে, পানি তখন পান করি যখন ভিতর থেকে পানি পানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শোবার জন্য বিছানার ওপর ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি যখন আমাদের এ খবর মিলে যে, আমাদের শিরাগুলোর আরামের প্রয়োজন। খুশির জযবা বা অনুভূতি আমাদের ওপর ঐ সময় প্রকাশিত হয়, যখন আমাদের খুশির বিষয়ে কোনো খবর জমা হয়। এরূপে অসন্তুষ্টি, রাগ ইত্যাদিও খবরের ওপর নির্ভর করে হয়।

অজু করার নিয়ত মূলত আমাদের এ কথার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে যে, আমরা এ কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্য করছি। অযুর বিধান পূর্ণ করার পর যখন আমরা মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছি তখন আমাদের মেধা আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি থেকে ঘুরিয়ে আল্লাহ তায়ালার সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। মাসেহ করার সময় যখন আমরা মাথার ওপর হাত বুলাই মাথার চুলগুলো (Antenna) এ কথাকে গ্রহণ করে যা সকল প্রকারের কুসংস্কার, বঞ্চনা এবং আল্লাহ তায়ালার গণ্ডির বিপরীত, অর্থাৎ বান্দার মেধা এ সংবাদকে গ্রহণ করে যা সকল সংবাদের মূল উৎস (আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা)-এর রাস্তাই আমাদের রাস্তা।

কান মাসেহ করা

কান মাসেহ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। কানের ভিতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙুল দ্বারা এবং বাহিরের দিক (পিঠ) আঙুল দ্বারা মাসেহ করার মাধ্যমে কানের সকল প্রকারের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং এর দ্বারা শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে থাকে। যখন কানগুলো মাসেহ করা হয় তখন হৃদয়ের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে থাকে।

ঘাড় মাসেহ করা

অজুতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অজু তা যার মধ্যে ফরজ, সুন্নত এবং মুস্তাহাব একত্রে করা হয়। মুমিনের ঘাড় মাসেহ করাও ফযীলতপূর্ণ। এভাবে হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلٰى عُنُقِهٖ وُقِىَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ -

“যে ব্যক্তি অজু করল এবং দু হাত দ্বারা স্বীয় ঘাড় মাসেহ করল ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেত) কিয়ামতের দিন সে ঘাড় জিঞ্জির (শিকল) থেকে বেঁচে যাবে।

ঘাড় মাসেহ করায় বড়ই চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। একজন ফ্রান্সের মস্তিষ্কের সার্জন-এর বক্তব্য হলো ঃ

“আমি যে রিসার্চ (গবেষণা) করলাম এ অনুযায়ী যদি চুল অনেক বড় হয় এবং ঘাড়কে শুষ্ক রাখা হয়, তাহলে এদের মধ্যে কয়েকবার শুষ্কতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মানবদেহে এর প্রভাব পড়ে থাকে। কোনো কোনো সময় এমনও ঘটে যে মানব মস্তিষ্কে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ জন্য ডাক্তারগণ উপলব্ধি করেন যে, ঘাড়কে দিনে দু' চার বার অবশ্যই ভিজাতে হবে।”

এ থেকে বুঝা যায়, ঘাড় মাসেহ করার দ্বারা মানুষ অনেক প্রকারের মস্তিষ্কের রোগ থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করে।

অধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞগণ মানবদেহকে ছয় অংশে বিভক্ত করেছেন। এক অংশ হলো ‘হাবলুল ওয়ারীদ’ জীবন শিরা বা শাহরগ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ “আমি তার জীবন শিরা– শাহরগের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী।”

এবং খারাপ থেকে ফিরিয়ে পবিত্রতার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করায়, অনুরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও নামাজ সাহায্যকারী বটে। শরীরকে কেতা-দুরস্ত রাখতে, শিরার কষ্ট ও জোড়াগুলোর রোগ থেকে বাঁচাতে এবং খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে নামায অনেক প্রভাবশীল জিনিস। মানব স্বাস্থ্যের জন্য নামাযের একটি উপকারিতা এও যে, এটি আমাদের রক্তের কলেস্টরেল অর্থাৎ চর্বিকে কমানোর ক্ষেত্রে একটা সীমা পর্যন্ত কাজ করে।

সালাত এবং দেহের বর্ধন ও উন্নতি

ডাক্তার ও হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পি এইচ. ডি. প্রধান চিকিৎসা ও আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়) তার লেখা "ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি" তে লিখেন ঃ

"যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য ব্যায়াম ও সংযম হিসেবে গণ্য হবে। যার দ্বারা মানুষের সকল অঙ্গের বৃদ্ধি উত্তম হবে এবং তার শক্তি বাড়বে। এছাড়াও জোড়াগুলোর সচলতা সুস্থ থাকবে এবং জোড়াগুলো তাদের কাজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে থাকবে এবং জোড়াগুলো বিভিন্ন প্রকারের রোগ যেমন জোড়া শক্ত হওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। এ ছাড়াও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ম, রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং পচনপ্রক্রিয়ার ওপরও উত্তম প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানুষ জীবনভর বিভিন্ন প্রকারের রোগ ও শারীরিক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে আর মানুষ জীন্দেগীর কর্তব্যসমূহ সঠিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আদায় করতে থাকবে।"

(ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি, পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)

সর্বোত্তম ব্যায়াম

নামায একটি উত্তম ইসলামী ব্যায়াম, যা মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না। অন্যান্য সকল ধর্মের মধ্যে এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নহে যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়া ও শক্তিশালী হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, ইহা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের সকল অঙ্গগুলোতে পড়ে এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬, প্রাগুক্ত)

১০. সালাতের রহস্য

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী-এর ধারণা এই যে, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান নামাযের রহস্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রাখতে অক্ষম। তিনি লিখেন–

No science has power to unrave or outline the mysteries of prayer. In particular, to view prayer merely as a physical exarcise is as ridcoulous as believing that there is nothing more to the Universe than the air we breathe.

"কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের রহস্য উপলব্ধি বা রহস্যের উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, পৃথিবীতে আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।"

উত্তম ব্যবস্থাপত্র

ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও এর দৈহিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দেন নি। এভাবে তিনি লিখেছেন–

It today even materialits acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.

"আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, জোড়ার ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য আজ নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।"

কেমিস্ট্রির ব্যবস্থাপত্র

নামাযের ব্যায়াম যেমন বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যম, এটা তেমনি এরূপ ভিতরের অঙ্গগুলো যেমন– হৃদয়, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং দেহের সকল গ্লান্ড (Glands) ইত্যাদি সুদৃঢ় করে ও উন্নত করে এবং দেহের শিডিউল এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে।"

নামাযের প্রচলন যদি হতো তাহলে

কিছু রোগ এরূপও আছে যেগুলো থেকে নামায চালু করার দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, কেননা নামায আদায়ের মাধ্যমে দেহে এ সকল রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ডাক্তার হাসান গজনবীর এ বাক্যগুলো চিন্তার খোরাক জোগায়। তিনি লিখেন ঃ

In addition to saving us from the sins and elevating us to the heights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. They keep our body active, help digestoin and save us from nuscase and joint diseaes through regular balanced exercise. They help the circulation of blood and also nitifate the bad effect of cholesterol. Prayers a vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyses. diabetes mellitus etc.. Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission from their doctor to leave bad. (Islamic Medicine .. P.-68)

"আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর সাথে সালাত আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় ধরনের সাহায্য করে। এটি আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখে, হজমে সাহায্য করে, আমাদেরকে জড়তা ও জোড়ার রোগ থেকে নিয়মিত সুষম ব্যায়ামের দ্বারা রক্ষা করে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালনে এবং কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সালাত হার্ট এ্যাটাক, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ..... হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত, যেমনিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন।" **(প্রাগুক্ত)**

পশ্চিমারা আজ হরেক রকমের ব্যায়াম করছেন যাতে তাদের দেহের কলেস্টেরল গড়মাত্রা সীমাতিক্রম না করে। এ ছাড়াও এদের দেহ সকল প্রভাবশীল পন্থায় কাজ করে। তাঁরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামী নামায যা কোনোরূপ ব্যায়াম নয় অথচ তা নানারূপ ব্যায়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। তা স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। যেমন জার্মানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা "ডি হায়েফ"-এ প্রসিদ্ধ জার্মান মান্যবর ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডি জুলফ এ সত্যকে প্রকাশ করেছেন তার জবানীতে। তিনি লিখেছেন ঃ যদি ইউরোপে ইসলামী নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়াম ও নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না। (আল মাসালিহুল আমলিয়াহ লিল আহকামিশ শরইয়াহ পৃ.-৪০৬)

সর্বোত্তম পর্যায়ের চিকিৎসা

এক পাকিস্তানী ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ইউরোপে ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য গিয়েছেন। যখন সেখানে সম্পূর্ণ নামাযের ব্যায়াম

পড়ালেন এবং বুঝালেন তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমরা এতদিন পর্যন্ত নামাযকে এক ধর্মীয় আবশ্যক বলেই জানতাম এবং পড়তে থাকতাম, অথচ এখানে তো আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয় যে, নামাযের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

ডাক্তার সাহেব তাকে একটি তালিকা প্রদান করেন যা নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে নিরাময়ে হয়–

১. মানসিক রোগ (Mental Diseases)

২. স্নায়বিক রোগ (Nerve Diseases)

৩. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)

৪. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ
(Restlessness, Depression and Anxiety)

৫. হার্টের রোগ (Heart Diseases)

৬. জোড়ার রোগ (Arthritis)

৭. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to Uric Acid)

৮. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

৯. চিনি রোগ (Diabetes Mellitus)

১০. চোখ এবং গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E.N.T Diseases)

মনস্তাত্ত্বিক রোগ

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন– গুনাহ, ভয়, নীচুতা হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানী ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। যার বর্ণনা পুস্তকের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে বাদ দিতে হচ্ছে। একই সঙ্গে নামায দ্বারা পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়াও দৈহিক ও মেধাগত উপকারিতাও হয়। আজ ইসলামী ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক।

ব্যায়াম ও নামায

নামাযের রুকনগুলো এককভাবে য্যাখ্যা করলে তার আলোকে দেখা যায় নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের মধ্যেই বিশেষ অঙ্গ ও জোড়ার আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ অঙ্গগুলোর ব্যায়াম হয়। শরীরতত্ত্ব বিদ্যার (Physiology) একটি

মূলনীতি এই যে, যখন মানুষ নড়াচড়ার ইচ্ছা করে তখন সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে নড়াচড়া স্নায়ুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে উদ্দীষ্ট কাজ করে থাকে এবং যখন নামায আদায়ের সুরতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন এ আকার একটি ব্যায়ামের প্রকৃতি গ্রহণ করে যার দ্বারা অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। এভাবে নামাযের সকল রুকন আদায়ের মাধ্যমে মানবের সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব দেহের সতেজতা ও শক্তি বহাল থাকে এবং দৈহিক কার্যাবলী প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।

সামগ্রিক ইবাদত

নামায একটি উত্তম ইসলামী ব্যায়াম, যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। আলসতা ও অবসাদকে দেহের মধ্যে বাড়তে দেয় না। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যা আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সকল অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযের মধ্যেই রয়েছে যে ইহা সমগ্র ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব সমগ্র মানব অঙ্গের ওপর সমভাবে পড়ে এবং দেহের সকল অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত থাকে। (ইসলামী স্বাস্থ্য বিধি, পৃ.–৩৬, মু. কামালুদ্দীন হামদানী)

কঠিন বস্তু সচল করা

নামাজ আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্য ব্যায়াম এ জন্য এর মধ্যে দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদা এগুলোর বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়া হয়ে থাকে এবং নামাযী এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর অবস্থান, পরিবর্তিত হতে থাকে ও নামাযে দেহের অধিকাংশ জোড়া নাড়াচাড়া করতে থাকে এবং এর সাথে বেশির ভাগ অদৃশ্য অঙ্গগুলো পাকস্থলী, অন্ত্র, শ্বাস যন্ত্র, এবং খাদ্যের অঙ্গগুলো এসবগুলোর গঠনে নড়াচড়া এবং পরিবর্তন আসে। অতঃপর এ অবস্থায় কোনো কথা নিষেধকারী যে এ সকল নড়াচড়ার দ্বারা কিছু অঙ্গ শক্তি অর্জন করবে এবং অপ্রয়োজনীয় আবশ্যিক জিনিসগুলো সচল না হবে? (তিব্বে নববী, পৃ.-৩৯৯, ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ)

১১. নামাযের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

এখন ধারাবাহিকভাবে নামাযের কিছু আরকানের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করা হলো ঃ

১. তাকবীরে তাহরীমা

যখন আমরা হাতগুলোকে কান পর্যন্ত উঠাই তখন বাহু, ঘাড়ের পিঠ এবং কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম বহুত উপকারী। যখন এই ব্যায়াম নামাযীর দ্বারা নামায পড়ার মাধ্যমে একাকী হয়ে যায় এবং এই ব্যায়াম প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা থেকে রক্ষা করে।

নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

মস্তিষ্কে কোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেড়ে যায়। এ সকল বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা সচল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে কোটি কোটি কোষের মতো গর্তও হয়, মস্তিষ্কের একটি গর্ত এরূপ আছে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছবি নিতে থাকে এবং বিভক্ত করতে থাকে। এই ছবি খুবই কালো হয় এবং খুবই চমকদার হয়।

একটি গর্ত আছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এবং এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ঐ সকল কথাও হয়ে থাকে যেগুলোকে অনুভূতি দৃষ্টি ও অনুমান করতে পারে এবং যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সংশোধন নাম দিয়ে থাকি। নামাযী যখন হাত উঠিয়ে উভয় কানের লতির নিকট নেয় তখন এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুবই সূক্ষ্ম তাপ নিজ কনডেন্সর (Condensor) বানিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এই গর্তের সেল/ কোষগুলোকে চার্জ করে দেয়। যাকে অনুভূতি দেখতে ও আন্দাজ করতে পারে। এই কোষগুলো চার্জ হয়ে মস্তিষ্কে আলোর ঝলকানি হয় এবং এ ঝলকানি দ্বারা সকল স্নায়ু প্রভাবিত হয়ে এই গর্তের দিকে মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক সংশোধন নিহিত রয়েছে। সাথে সাথে হাতের মধ্যে এক তেজী প্রবাহ মস্তিষ্ক থেকে স্থানান্তর হয়।

কিয়াম বা দাঁড়ান

কিয়াম বা দাঁড়ানোর দ্বারা দেহ সম্পূর্ণরূপে অনড় ও শান্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও মানবদেহের ওপর বহু প্রকারের প্রভাব আচরিত হয়। তা এরূপ–

যখন নামাযী কিরাআত শুরু করে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা মুতাবিক উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন, যে ব্যক্তি তা কানে শোনে, এ সকল কুরআনের আয়াতের আলোগুলো সারা দেহে প্রবাহিত হয়, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য এক বিরাট পরশ পাথর।

কিয়াম দ্বারা দেহের প্রশান্তির পদ্ধতি অনুভূত হয়। নামাযী যেহেতু কিয়ামের মধ্যে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করতে থাকে এ কারণে তার দেহ এক জ্যোতির বৃত্তের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লেপ্টে থাকে এবং সে যতক্ষণ এ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি "নূর" থেকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বলে এর বেষ্টনীর মধ্যে থাকেন।

কিয়ামের মধ্যে নামাযী যে অবস্থায় থাকে যদি আমরা প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ (৪৫) মিনিট পর্যন্ত এ অবস্থায় খাড়া থাকি তাহলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উন্নতমানের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। কিয়ামের দ্বারা পরবর্তী মস্তিষ্ক (Pons) যার কাজ হলো আচরণ, প্রচলন এবং মানব দেহের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করা, শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ এমন এক মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে থাকে যে, যার দ্বারা মানুষ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।

হাত বাঁধা

হাত বাঁধার সময় কনুইর আগে-পিছে থাকা পেশি এবং বগলের পিছের নড়ার পেশি অংশ নেয় এবং সেগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

নামাযে বাম হাত নিচে বাঁধা হয় এবং ডান হাত দ্বারা তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়। মূলতঃ মানব অঙ্গগুলোর ডান ও বাম দিকের কার্যকরণ পৃথক পৃথক। ডান অংশ থেকে বিশেষভাবে ডান হাত থেকে অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বের হয় যা ধনাত্মক (Positive) হয়ে থাকে। সর্বদাই ডানহাতের ধনাত্মক রশ্মি (Positive rays) বাম হাত থেকে স্থানান্তর হয়ে শক্তি, সামার্থ্য এবং নড়াচড়ার কারণ হয়ে যায়, যার কারণে মানবদেহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং মানুষ পেরেশান বা অস্থির হয় না।

নামাযে নারী ও পুরুষ এক স্থানে হাত বাঁধেন না, বরং পুরুষ নাভীর নিচে এবং নারী বুকের ওপরে হাত বাঁধেন। এর দ্বারাও মানব দেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়। পুরুষ যখন নাভী বা তার নিচে হাত বাঁধে তখন উভয় হাত থেকে তরঙ্গ বের হয় যা ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) হয়ে থাকে।

এখন এই তরঙ্গমালার মিশ্রণে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় যা নাভীর মাধ্যমে স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছে যায় দ্বারা প্লীহা, বৃক্ক (Adrenal Glands) শক্তিশালী হয়, যার দ্বারা যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও সচল হয়।

মহিলাগণ নিয়তের পর যখন বুকের ওপর হাত বাঁধে তখন তার হার্টে স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণতা প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি ও উন্নতি পায় যার ওপর বাচ্চাদের খাদ্য সীমিত হয়ে থাকে। নামায প্রতিষ্ঠাকারী মায়েদের দুধে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, মহিলাগণ যখন বুকের ওপর হাত রাখে এক বিশেষ মুরাকাবা করে, যাতে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছুর ওপর প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করে (যেমন নামাযে হয়) তাহলে এ অবস্থায় এক বিশেষ প্রকারের রশ্মি (Rays) সৃষ্টি হয়, যা ডাক্তারদের কথায় হালকা নীল অথবা সাদা রঙের হয়ে থাকে যা তার দেহে প্রবেশ করে ও বাহির হতে থাকে এবং তার দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ দেহ কখনো কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে না।

রুকু

হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমরকে ঝুকানোর অবস্থাকে রুকু বলা হয়। এ নড়াচড়ায় দেহের সকল পেশির ব্যায়াম হয়ে যায়। এর মধ্যে নিতম্বের জোড়া ঝোঁকানো (Flexion) হয়, কনুইগুলো সোজা টান (Extended) হয় এবং মাথা ও সোজা হয় এ সময় সকল পেশি শক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু পেট কোমরের পেশি ঝোকে এবং সোজা হবার সময় কাজ করে। এভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম রুকুর মধ্যে হয়ে যায়।

সম্মানিত ডাক্তারগণ রুকু এবং সিজদাকে টাখনু এবং কোমর ব্যথার রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুকুর মধ্যে হারাম মগজ (Spinal Cord)-এর কাজ কারবার বৃদ্ধি পায় এবং ঐ রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় তিনি এ রোগ থেকে খুব দ্রুত আরাম পেয়ে থাকেন। রুকু দ্বারা কোমর ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার হারাম মগজ ফুলে (Inflamation of spinal cord) গিয়েছে, তিনি খুব দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন।

রুকুর দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের নলার অবসাদগস্ত রোগী চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। রুকুর দ্বারা মস্তিষ্ক ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঞ্চালন (Circulation of Blood)-এর কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সিজদা

সিজদার মধ্যে নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও কনুই এর ওপর ঝোঁকানো (Flexion) হয়ে থাকে। যখন নলা এবং রানের পিছনের পেশি এবং কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগুলো এর বাহিরের দিক থেকে টান লাগে। এর সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও চেপে যায়।

সিজদার মধ্যে নারীদের হাঁটুর সাথে বুক মিলানো উত্তম। এটা গর্ভাশয়ের পিছনের (Retrorersions of Uterus)-এর উত্তম চিকিৎসা। সিজদার মধ্যে আরো অনেক শারীরিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। মস্তিষ্কের জন্য রক্তের খুব প্রয়োজন। কেননা সে সকল অঙ্গের মূল। কিন্তু এর অবস্থান স্থল এরূপ যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌঁছানো কিছুটা মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে একত্রিত করার জন্য সিজদা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আমল।

মস্তিষ্ক সাধারণ অবস্থায় বেশির ভাগ সময় হার্ট থেকে উঁচু থাকে, এজন্য মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না, সিজদার দ্বারা মস্তিষ্কে হার্টের নিচে পড়ে এজন্য এ সময় এর রক্ত সহজে পৌঁছায়।

সিজদা যত দীর্ঘ হবে ততই বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সিজদার ফযীলত বর্ণনা করেন। এর ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত সুস্থ থাকে। যেকোন বয়সে মহান রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কৃত লম্বা সিজদার দ্বারা আত্মিক, মস্তিষ্ক, মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের জন্য সহযোগী হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফের মতে "সিজদায় উভয় হাত এবং সকল অঙ্গের এক মোহের সাথে প্রসারিত করা এবং সংকুচিত করা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করে।(আল মানালিহুল আকলিয়াহ, লিল আহকামিন নকলিয়াহ পৃ.- ৪০৬)

নামাযী ব্যক্তির চেহারার ওপর সতেজতা থাকে। কেননা নামায এবং সিজদার কারণে এর সকল শিরার মধ্যে রক্ত পৌঁছায়। যে নামায পড়ে না তার চেহারার ওপর এক ধরনের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে।"

কা'দা বা বৈঠক

দু অথবা চার রাকআত পর আমরা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসি, একে কা'দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে,

কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে এজন্য এ সকল অঙ্গে হালকা পাতলা ব্যায়াম হয়ে যায়।

ব্যায়ামের এ নিয়ম যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ চুপ থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে বা সংশ্লিষ্ট হালকা পাতলা ব্যায়াম করতে হবে। নামাযেও রুকু এবং সিজদার পরে বৈঠকে বসা এ নিয়মগুলোর উত্তম প্রকাশ।

সালাম ফিরানো

অস্ত্রোপচার মেডিকেল কলেজ মুলতানের ডাক্তার কাজী আব্দুল ওয়াহেদ-এর মতানুযায়ী নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা ডানে বায়ে ফিরানোর প্রয়োজন হয় এবং এক নামাজে এরূপ কয়েক বার (ফরজ সুন্নত মিলে) করার প্রয়োজন হয়। এরূপকারীর হার্টের রোগ (Heart Diseases) এবং এর মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকে এবং খুব কমই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

ছালাম ফিরানোর সময় ঘাড়ের ডান-বামের দিকের পেশি সক্রিয় থাকে। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান করেছেন। এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম ইত্যাদি) ওপর টিকে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে সচল রাখে। থেমে থেমে নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন হয় জামায়াতে পড়ার জন্য। এটা এক উচ্চমানের ব্যায়াম হিসেবে মানা হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চলাচলের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যাওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যাতে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে নামাজ আদায়ের জন্য নড়াচড়া করতে থাকে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের নিকট স্বীয় দাসত্ব এবং বন্দেগী পেশ করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এবং তদীয় রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা আবশ্যক করেছেন। এ সময়গুলো বিভিন্ন হওয়ার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা পাওয়া যায়। এক মুসলমান নামাযী পাঁচ সময়ে এ নামাজগুলো আদায় করেন এবং এ ছাড়াও তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল ﷺ-এর সুন্নত। যার সময় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে।

এখন নামাযগুলোর বিভিন্ন সময় হওয়ার বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাগত উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা কিছু এরূপ ঃ

তাহাজ্জুদের সময়

অভিজ্ঞজনদের অনেক বিশ্লেষণ এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপকারিতা অর্জনের বিষয় প্রমাণিত–

১. তাহাজ্জুদের সময়ে সালাত আদায় করা অস্বস্তি ও নিদ্রাহীনতার চিকিৎসা।

২. তাহাজ্জুদ সালাত হার্টের রোগের জন্য বড় ধরনের ওষুধ।

৩. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা স্নায়ুর সংকোচন ও বন্ধনের জন্য উপকারী।

৪. মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ করে পাগল হওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যার জন্য শেষ চিকিৎসা হলো তাহাজ্জুদ।

৫. তাহাজ্জুদের সময় সালাত আদায় করা দৃষ্টির রোগগুলোর পরিপূর্ণ চিকিৎসা। তাহাজ্জুদ নামায বিশেষভাবে এ সকল লোকের জন্য নিরাময় যারা প্রত্যেক জিনিস দুটি দুটি দেখে।

৬. তাহাজ্জুদের নামাজ মানবদেহে বুদ্ধি, আনন্দ এবং অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করে যা নামাযীকে সারাদিন উৎফুল্ল রাখে।

এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে একান্ত নৈকট্য হাসিল করে। রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পরে এটা বুঝতে হবে যে, মধ্যরাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগে আগে তাহাজ্জুদের সালাতের সময়। নামাযী যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে। তখন ঐ সময় তার মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তার অনুভূতি অদৃশ্য নড়াচড়া এবং অদৃশ্য রশ্মিগুলো সহজে গ্রহণ করে নেয়। এজন্য সুফিয়া কেরাম (র) বলেন, যে আল্লাহর ওলী যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। তাহাজ্জুদ গোযার-এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল ও মারেফাত অর্জনের সর্বশেষ সিঁড়ি হলো তাহাজ্জুদের সালাত।

ফজরের সময়

যখন রাত শেষ হয়ে আসে, তখন ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায ফরজ করা হয়েছে। যা হালকা এবং যখন প্রকৃতির ওপর চাপ নেই। সারারাত আরাম করার পর যখন পাকস্থলীও খালি হয়ে যায়, কঠিন শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এরূপ করায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য এ সময় হালকা ও

সংক্ষিপ্ত নামাজ নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। বরং কোনো নামাযী যেন এই চার রাকআত নামায পড়ে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে। ফজর নামায পড়ে লোকেরা নিজ অবসাদগ্রস্ত দেহকে পুনরায় সক্রিয় ও চলমান করে। এরপর সারাদিন যাবৎ নিজ রিযক ও জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজকর্মে মনোযোগ দেয় এবং মস্তিষ্ক পুনরায় চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সুবহে সতেজ প্রকৃতি এবং আলোতে মানুষ নামাযের জন্য বাইরে বের হয় এবং পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, এতে সতেজ পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশে থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

ফজর নামাযের জন্য নামাযীকে নিজ দেহকে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। সে অজু করে নিজ দেহের অঙ্গগুলোকে ধোয়, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। যদি এগুলো না করে তাহলে মুখ এবং দেহের ওপর জীবাণু লাগতে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণ মানুষ নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এজন্য ফজরের নামাজ ফরজ হওয়ার এক কারণ এই যে, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মমাফিক হও।

জোহরের সময়

দিন শুরুর সাথে সাথে মানুষ জীবিকা অর্জনের মধ্যে লেগে যায়। ধুলা-ময়লা তার গায়ে লাগে। কিছু কেমিক্যাল হাত পায়ে লাগার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা মানুষ জীবাণু বিযুক্ত বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন তার দেহের ওপর জীবাণু আক্রমণ করে থাকে। এছাড়াও দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে করতে শ্রান্তিও অনুভূত হতে থাকে। এ কারণে একজন নামাযী জোহর নামাযের জন্য অযু করে যাতে স্বীয় হাত, মুখ, পা ইত্যাদি ধৌত করে যাতে রোগের কোনো আশঙ্কা না থাকে।

ক্লান্ত দেহ জোহরের নামায পড়ে আরাম ও প্রশান্তিও অনুভব করে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়, যার দ্বারা শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। এ সকল উপকারিতা একজন নামাযীর জোহরের নামাযের সময় অর্জিত হয়।

দুপুর পর্যন্ত কঠিন গরম পড়ার কারণে সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যেতে শুরু করে। যদি এ ক্ষতিকর গ্যাস মানবদেহের ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে যায়। তার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয় এবং সে পাগলামিরও শিকার হয়ে থাকে। তাই সে দুপুরের সময় জোহর নামায পড়ার জন্য অজু করে নিজ দেহকে পুনরায় সতেজ ও প্রশান্তময় করে। অজুর দ্বারা সে বিষাক্ত গ্যাস থেকে নিজ দেহকে বাঁচিয়ে নেয় এবং কয়েক প্রকারের জীবাণুকে স্বীয়

দেহ থেকে বের করে। এজন্য স্বয়ং স্রষ্টা এ গ্যাস উঠার সময় অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় জোহরের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আসরের সময়

জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, পৃথিবী দুই ধরণের (গতিতে) চলে। যেগুলো হলো ঃ ১. লম্ব, ২. বৃত্তীয়।

যখন সূর্য ঢলতে থাকে, তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে এমনকি আসরের সময় ঘূর্ণনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। এ কারণে মানুষের ওপর দিনের অনুভূতির পর রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে, প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। এতে আবার নামাযের সময় মানুষের সচেতন অনুভূতির ওপর অচেতন অনুভূতির প্রভাব শুরু হয়, যার দ্বারা মানুষ স্বীয় আরামের অনুভূতি করতে থাকে।

যে কোনো নামাযী আসর নামাজের জন্য অজু করে নিজে নিজে জাগতিক সমস্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিতে পারে এবং স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদতে লেগে যেতে পারে, যার দ্বারা অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত না হয় এবং অচেতন অনুভূতির আক্রমণকে সহ্য করার যোগ্য হয়ে যায়।

নামাযে নূরানী রশ্মি নামাযীকে প্রশান্তি প্রদান করে। যার কারণে সে আত্মার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং আসরের সালাত আদায় করে আত্মিক নড়াচড়া গ্রহণ করতে থাকে।

মাগরিবের সময়

মানুষ সারাদিন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায় এবং নিজ ও পরিবারের জন্য রুজী কামাই করে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে যে সেই মহান সত্তা এগুলো অর্জন করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন। এটা আনন্দের মধ্যে হয়, যার দ্বারা অন্তর এক বিশেষ প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। মাগরিবের সময় সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজিরা দিয়ে নিজ দাসত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে এবং নূরানী তরঙ্গমালা দ্বারা ভরে যায়, যা তার আত্মাকে প্রশান্তি প্রদান করে। এই আলোকিত অদৃশ্য তরঙ্গমালার প্রভাব এদের বাচ্চাদের উপরও পড়ে যাতে তারা শিষ্ট ও সৌভাগ্যবান হয়। যে মুসলমান মাগরিবের সালাত বৈধ পন্থায় নিয়মমাফিক আদায় করে তার সন্তানগণ স্বীয় পিতামাতাকে মান্য করে। এ ধরনের নামাযীদের বাচ্চাগণ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে এবং তাদের ঘরের চতুর্দিকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ হয়ে থাকে।

ইশার সময়

মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভী। যখন সে কাজকর্ম থেকে ফিরে ঘরে আসে, খানা খায় এবং স্বাদ ও লোভের কারণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। যদি সে খাওয়ার পর পরই শুয়ে পড়ে, তাহলে সে ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয়। মানুষ যদি সারা দিন ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত খাওয়ার পরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে যায় তাহলে সে অস্থির থেকে যাবে। শোয়ার আগে এবং অতিরিক্ত খানা খাওয়ার পরে কমবেশি ব্যায়াম করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

বৎস! দিনের ক্লান্তিকর ঘাম এবং অতি খাবার খাওয়া লোভী মানুষের জন্য ইশার নামায কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কম নয়। ইশার নামায দ্বারা শান্তি, আনন্দ সহজ হয় এবং সাথে সাথে নামাযের শৃঙ্খলার মাধ্যমে খানা হজমের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে।

এভাবে ইশার নামাযের মতো দীর্ঘ নামায আদায় করে শোয়া ব্যক্তি যারা রাতে প্রশান্তি ও আরামের ঘুম ঘুমাবে এবং তার খানাও হজম হয়ে যাবে। বর্তমানে চিকিৎসায় অভিজ্ঞগণও শোয়ার পূর্বে হালকা-পাতলা ব্যায়ামের ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, এই ব্যায়াম কয়েক প্রকারের ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা করে। হকপন্থীগণ এও বলেন যে শোয়ার পূর্বে নামাযের চাইতে সুন্দর ব্যায়াম আর নেই।

১২. নামায ও দার্শনিকবৃন্দ

শেষ কথা এই যে নামায যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, সেখানে দৈহিক ব্যায়ামও। এ ব্যাপারে কতিপয় দার্শনিকদের মতামত নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

১. রিভরান লীবান

ইউরোপীয় দার্শনিক রিভরান লীবান নামাযের ফযীলতের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

আমি কয়েকবার খ্রিস্টীয় ও ইহুদীদের নামাযের সাথে মুসলমানদের নামাযের তুলনা করেছি। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী নামায উত্তম। আমি উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামী নামায কয়েক নামাজের সমষ্টি। এর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ও গুণকীর্তন ছাড়াও এক স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। ইসলামী নামাযে আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো এই যে, এর মধ্যে কুরআন তিলওয়াত, রুকু, সিজদা

এবং তাশাহহুদ রয়েছে তার মধ্যে কাকুতি মিনতি এবং আশ্চর্য ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর কান্না কাটিও রয়েছে।

আমি বেশিরভাগ জুমুআর দিন আলেক্সান্দ্রার জামে মসজিদে শুধু ইসলামী নামাযের অবস্থা দেখার জন্য যেতাম। আমি যখন খতীবের জোশে ভরা বক্তৃতা, কাতারগুলোর ধারা, রুকু, সিজদার গুরুত্ব এর ওপর চিন্তা করি তখন আমার অন্তরের ওপর আশ্চর্য রকমের প্রভাব পড়ে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পেরে ছিলাম যে, ইসলাম আমাকে আহবান করছে এবং তার ইবাদতের পূর্ণ পদ্ধতি আমার আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। (দি লেকচার অফ বমীচার-পৃ. ৪৭)

২. রায়ন জেমস মর্ডিলার

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক রায়ন জেমস মর্ডিলার বলেন, গোঁড়ামি দ্বারা কাজ আদায় করা সহজ কিন্তু সত্য বলা দোষের এবং আমি বর্তমানে এই সমস্যা সংকুল কাজ (সত্য বলা)কে বাছাই করে নিচ্ছি। আমি বারবার মুহাম্মদী বন্ধুদের (মুসলমানদের) সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছি এবং তাদের বিশ্বাসের ব্যাখ্যার মধ্যে মশগুল ছিলাম। চৌদ্দ শতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই মুসলমান নিজ পয়গম্বর (আ) কে মহব্বত ও আনুগত্য করছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কশীল সকল জিনিসেও ভালবাসা রাখে। খ্রিস্টান জগতের জন্য মুসলমানদের এই মহব্বত এবং একনিষ্ঠতার মধ্যে এক শিক্ষা রয়েছে।

ইসলামী আবাদীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের অনুসরণ– যার নাম নামায। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ করে। প্রকাশ্য এ আকীদা বৈধ নয়। কেননা নামাজীও খারাপ দিকে ঝোঁকে এবং নজর দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি যে দিনে পাঁচ বার নামায পড়ে অর্থাৎ এক মাসে একশ পঞ্চাশ বার নিজ আল্লাহ তায়ালা থেকে তাকওয়া অর্জন এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা করে, অবশেষে একদিন সে নিজের ওয়াদায় পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ সে বাস্তবিকই পরহেযগার; মুত্তাকী হয়ে যায়।

৩. সেন্ট হিটলার

সেন্ট হিটলার রোমের প্রসিদ্ধ পাদরি স্বীয় পুস্তক The Pray তে লিখেছেন ঃ

আমি যে যে ইসলামী রাষ্ট্র সফর করেছি, সেখানে উপাসনালয়গুলো অবশ্যই দেখেছি। এ ধারাবাহিকতায় ইসলামী নামাজের ওপরও চিন্তা করেছি। আমার দৃষ্টিতে

এটা এক উত্তম প্রকারের ইবাদত। যখন এক আল্লাহতে ইবাদতকারী নিজস্ব সকল কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা-কীর্তনের গান গায় তখন রূহ অস্তিত্বে আসে। তখন অবশ্যই ঐ নামাযী স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

এমনকি সে সকল শক্তির সাথে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। যার ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং অন্তর কলুষমুক্ত হয়। বাড়তি এই ইবাদতের মধ্যে দৈহিক শক্তির আনুগত্যও রয়েছে। আমি দেখেছি যে, নামাযী ব্যক্তি দুর্বল নয় বিশেষতঃ ফজর নামাযের জন্য ভোরে উঠা এক আশ্চর্য রকম প্রভাব রাখে।

৪. প্রফেসর ডা. বার্থস যুজফ

আমেরিকার বিখ্যাত প্রফেসর ও ডাক্তার বার্থাস জুযফ এর জীবনের অভিজ্ঞতা "নামায ও ইসলাম" শিরোনামে এক সাক্ষাৎকারের আকারে প্রকাশ হয়েছে। যার মধ্যে ডাক্তার সাহেব লিখেছেন।

"আমি গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, বাস্তবিকই নামায পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যায়াম (Exercise) এবং এর মধ্যে কোনো কমতি বা বাড়তির সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত এই ব্যায়ামের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অদৃশ্য পদ্ধতিতে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান, গাম্ভীর্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলী বুঝে নামাযের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।"

নামাযের মধ্যে হাত উঠানো, আবার বাঁধা, দৃষ্টিকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত রাখা, অতঃপর হাত ছেড়ে দেওয়া, এবং সামনে ঝুঁকে রুকু করা এরপর সিজদারত অবস্থায় মাথা নত করে হৃদয়কে মস্তিষ্কের দিকে রক্তকে গতির সাথে এবং বেশি পরিমাণে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং থেমে থেমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বসা বাস্তবিকই এক পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যায়াম-এর পন্থা।

৫. মিস্টার এম. কিং

মিস্টার এম কিং প্রকাশ করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এ কথায় চলে যে, যখন দুনিয়াবী কাজ এবং সামগ্রিক আনন্দে লিপ্ত থাকে তখন আত্ম সংশোধন বিষয় খেয়াল থাকে না এবং কিছু কিছু আনন্দের আবশ্যকীয় ফল এই যে, মানুষ স্বীয় স্রষ্টার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় যখন আমরা (মিস্টার এম. কিং) এ কথার ওপর চিন্তা করি যে, ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ

করেছেন এবং তাদের বাধ্য করেছে যে, সর্বাবস্থায় স্বীয় ফরজ আদায় করবে, তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নামায এক উত্তম প্রকারের হেদায়াত।

"যখন সত্য বিশ্বাসের অনুসারী কোনো ব্যক্তি (মুসলমান সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে) একনিষ্ঠ ও মুহাব্বতের সাথে স্বীয় স্রষ্টা ও মালিককে স্মরণ করে, তার গুণকীর্তন ও পবিত্রতার ঘোষণা করে তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং এই ক্ষমতাশালী ও পবিত্র সত্তা থেকে সাহায্য চায় তখন তাঁর আত্মা নিশ্চিতই এক পবিত্র অবস্থায় পৌঁছে যায়, এবং তার দিল ও দিমাগ থেকে ব্যক্তি পূজার মোহ দূর হয়ে যায়।"

আমি উচ্চ স্তরের মুসলমানদের দেখেছি যে, সে স্বীয় প্রভাব ও মর্যাদার কারণে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখেন এবং কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক তাদের সঙ্গে কথা বলার হিকমত রাখে না। অথচ যখন নামাযের সময় হয় তখন একজন বিশাল মর্যাদাশালী ব্যক্তি অনাড়ম্বর মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তার অপরিচিত ভাইদের সাথে মিলে ইমামের নেতৃত্বে ফরজ নামাজ আদায় করে। এ দৃশ্য থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, এই ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠতা ও রিক্ততার শিক্ষা রয়েছে এবং এর মধ্যে সমতার মর্যাদা দৃশ্যমান হয়।

সমতার বড় ঘটনা এই যে, ইসলামের রাসূল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্চর্যজনকভাবে আমীর-ফকীর এবং ছোট-বড়কে এক সারিতে সমবেত করেছেন এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিঃস্ব ও অহংকারকে যাদুকরীভাবে পাশাপাশি করে দেখিয়েছেন। আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, নামায একটি উত্তম ইবাদত।"

৬. স্যার উইলিয়াম ক্রাক্স

স্যার উইলিয়াম ক্রাকস স্বীয় কিতাব আধ্যাত্মিক "Research in the Phominon of Spiritualism" এ লিখেছেন ঃ

যদি কোনো মানসিক রোগী মুসলমানদের নামায খুশুখুযু (ভয় ও নম্রতা) এবং ধ্যানের সাথে পড়তে শুরু করে তাহলে সে খুব শীঘ্রই এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

৭. ভয়েস এডমার্ল

পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ভয়েস এডমার্ল স্বীয় পুস্তক "Ten Voice Usborne" এ লিখেন ঃ যদি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছাতে চাও তাহলে নামায পড়, নামায পড়, নামায পড়।

৮. দিওয়ান শিং মাফতুন

দেওয়ান শিং মাফতুন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ইন্ডিয়ান লিডার এবং সাংবাদিক। তিনি "রিয়াসাত (নেতৃত্ব)" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা নির্দিষ্ট বৃত্তে খুবই প্রসিদ্ধ হয়। দিওয়ান শিং মাফতুন এই প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"নামায সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়, যে শৃঙ্খলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতা শিখতে চায় সে যেন নামাযের ওপর চিন্তা করে। নামাযে মালিক ও চাকরের পার্থক্য ঘুচে যায়, যখন এই কাতারে মাহমুদ ও আয়ায (বাদশাহ ও ফকীর) এক সঙ্গে এবং এক সারিতে দাঁড়ায়। যদি মুসলমান নামায পড়তে আরম্ভ করে তখন তা-ই বিজয়ী হয় যা তারা কুরআনে বলেন। নামায ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের সর্বোত্তম উপায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাও খুশি এবং সৃষ্টিও সন্তুষ্ট থাকে।"

অভিজ্ঞ ইংরেজ

এক মুসলমান ইউরোপে নামায আদায় করছিলেন তখন এক ইংরেজ ব্যক্তি, দাঁড়িয়ে একে দেখতে থাকেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন তখন ইংরেজ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তুমি কোন কিতাব থেকে এই ব্যায়ামের পদ্ধতি শিখেছ? আমিও আমার পুস্তকে ব্যায়ামের এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছি এবং এই পদ্ধতিতে ব্যায়ামকারী দীর্ঘ জটিল ও কঠিন কষ্টকর রোগ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকবে। যদি দাঁড়ানো ব্যক্তি ব্যায়াম রত অবস্থায় সোজা নিচে সিজদায় চলে যায় তবে এর দ্বারা স্নায়ু ও হার্টের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে, এজন্য আপনি যেমন (রুকু) করলেন আমিও আমার পুস্তকে এরূপ লিখেছি এবং আমি এও লিখেছি যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে। এর মধ্যে হাত বেঁধে রাখবে। অতঃপর (রুকুর ন্যায়) ঝুঁকে হাত এবং কোমরের ব্যায়াম করবে। এরপর মাথা জমীনে রেখে ব্যায়াম করবে। এ ধরনের ব্যায়াম শুধু অভিজ্ঞদের কথায়ই রয়েছে। সকল লোক এর সৌন্দর্য সম্পর্কে জানে না। আপনি এই ব্যায়াম কার কথার ওপরে করেছেন?

ঐ মুসলমান বলতে থাকলেন

আমি মুসলমান। আমার দ্বীনে ধর্মীয় বিধানে নির্দেশ রয়েছে এরূপ করতে, আমি আপনার পুস্তক দেখিও নি। আমরা মুসলমানগণ আজ থেকে চৌদ্দশত বছরের বেশি

সময়ব্যাপী আমাদের নবী কারীম ﷺ-এর প্রদর্শিত এই আমল প্রত্যহ নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বার করি।

ইংরেজ এ কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং এই মুসলমানদের নিকট থেকে অধিক জ্ঞান হাসিল করতে থাকলেন।

১০. রোগ বিশেষজ্ঞ

এক পাকিস্তানী যিনি হার্টের রোগ আক্রান্ত ছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া গেলেন। ওখানে এক বড় বিখ্যাত অভিজ্ঞ হার্টের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিলেন। সাথে আট দিনের জন্য তিনি নিজে ফিজিও ওয়ার্ডে বিশেষভাবে ডাক্তারের উপস্থিতিতে ব্যায়াম করার নির্দেশনা দিলেন। এ ব্যায়াম খুশু খুযুর সাথে নামাজের মতো ছিল। রোগী উপযুক্ত পদ্ধতিতে ব্যায়াম করতে থাকলে ডাক্তার বললেনঃ

আপনিই প্রথম রোগী যিনি এত শীঘ্রই সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করছেন। অন্যথায় আট দিনে তো রোগী শুধু ব্যায়ামের পদ্ধতিই শিখে থাকে ঃ মুসলমান রোগী বললেন ঃ

আমি মুসলমান এবং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আমাদের নামাযের মতই।" এ কথা শুনে ডাক্তার আট দিন বাদ দিয়ে অন্য দিন এই মুসলমান রোগীকে কিছু ওষুধ দিলেন এবং ঐ ব্যায়ামের নির্দেশনা দিয়ে ছুটি দিয়ে দিলেন।

১১. ডাক্তার সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী

ডাক্তার সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচডি, প্রধান চিকিৎসক আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।) নিজ লেখা "ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি"– এতে লিখেন ঃ "যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার দেহের জন্য ইহা এক ব্যায়াম গণ্য হবে, যা দ্বারা যাবতীয় মানব অঙ্গসমূহ এর উন্নতি ও বৃদ্ধি হবে এবং এর শক্তি বেড়ে যাবে। ইহা ব্যতীত শ্বাসপদ্ধতি, রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি এবং হজম পদ্ধতির ওপরও উত্তম প্রভাব পড়ে এবং মানুষ জীবনব্যাপী রোগ ও শারীরিক সমস্যা থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (ইসলামে স্বাস্থ্যবিধি পৃ.-৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)

অন্য এক স্থানে লিখেন ঃ নামায এক উত্তম ইসলামী ব্যায়াম যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না।

সকল ধর্ম মিলে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নাই যার মাধ্যমে মানুষের সকল অঙ্গের আন্দোলন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযীর জন্যই অর্জিত হয় যে ইহা একান্তই ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়ামও বটে, যার প্রভাব মানুষের সকল অঙ্গের ওপর পড়ে থাকে এবং দেহের সকল অঙ্গের মধ্যে আন্দোলন ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য সঠিক থাকে। (প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬)

পশ্চিমের অধিবাসীগণ এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামী নামায যা কোনো ব্যায়াম না হয়েও উহা বিভিন্ন ব্যায়ামের কাঠামো) গ্রহণ করে যাতে সে স্বাস্থ্য সম্মত থাকে। যেমন জার্মানির প্রসিদ্ধ পত্রিকা "ডি হায়েফ" এ নামী জার্মানী সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ এ সত্যকে তার এ উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন ঃ

"যদি ইউরোপে ইসলামী নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়ামের নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না।" (আল মাহালিহ আকলিয়্যাহ লিল আহকামিন নকলিয়্যাহ পৃ. ৪০৬)

সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী লিখেন ঃ

যখন নামায আদায়ের পদ্ধতিতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন এক ধরণের ব্যায়াম হয়ে যায়, যার দ্বারা অঙ্গগুলো এবং জোড়াগুলোর উন্নতি, বৃদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যায়। এছাড়া নামাযের রুকনগুলো আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সকল অঙ্গের ব্যায়াম অন্য কোনো মাধ্যম ব্যতীত হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব দেহের সতেজ ও শক্তি স্থায়ী থাকে এবং দৈহিক ক্রিয়া-কর্ম প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।" (প্রাগুক্ত-পৃ. ৩৬)

১২. ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী

ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইউরোপে যান। যখন সেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ নামাযের মতো ব্যায়াম পড়ানো হয় এবং বুঝানো হয় তখন এই ব্যায়াম দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা নামাযকে এক ধর্মীয় ফরজ বুঝতাম এবং পড়তে থাকতাম অথচ এখানে আশ্চর্য রকমের আবিষ্কার হয়ে থাকে যে, নামাযের মত ব্যায়ামের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নির্মূল হয়ে যায়।"

১৩. হাকীম মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চাগতাঈ

"নামাযের ব্যায়ামসমূহ যা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য সৌন্দর্যের মাধ্যম তা **অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো** যেমন– হার্ট, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, পাকস্থলী, **মেরুদণ্ডের হাড়**, ঘাড়, বুক এবং সকল প্রকারের গ্লান্ডস (Glands)-এর উন্নতিও বৃদ্ধি করে এবং দেহকে রুটিনমাফিক ও সুন্দর বানায়।"

চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জা, মিসওয়াক, অজু ও নামায এমন ইবাদত যেগুলোর মাধ্যমে দেহ ও আত্মা উভয়ের হেফাযত করা হয় এবং নিজ দেহকে বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে সুরক্ষিত রেখে থাকে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান ও বুঝ

এ অধ্যায়ে নবী কারীম ﷺ-এর স্বাস্থ্য এবং বুঝ ও মেধার ব্যাপারে উচ্চতর নতুন ধরনের **বিশ্লেষণ** পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শক্তি ও সামর্থ্য এবং তাঁর বুঝ ও মেধার ব্যাপারে অমুসলিমদের বক্তব্য সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

اِصْطَفٰى ঃ নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) আল্লাহ তায়ালার বাছাইকৃত বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে (আ)– রিসালাতের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। একে কুরআনী পরিভাষায় اِصْطَفٰى বলা হয়েছে।

নবীগণ নিষ্পাপ। তাদের থেকে চিন্তা ও ইজতিহাদের ভুল হয় না এবং আসল আখলাকের ত্রুটিও হয় না। প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে তাদের আবেগ, চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও প্রকৃতি সবই পবিত্র হয়।

মানসিক রোগ

যে লোক থেকে গুনাহ সংঘটিত হয় না সে পাপের অনুভূতি (Guilt Complex)র রোগসমূহ থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। এ ছাড়া যা মানসিক ঈমান, তাকওয়া, ইবাদাত, দুয়া এবং চরিত্রের সম্পদের মালামাল, তিনি সর্বোচ্চ মনস্তাত্বিক স্বাস্থ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী হয়ে থাকেন। যেহেতু আম্বিয়া কেলামের মধ্যে উক্ত গুণগুলো সর্বোত্তম পর্যায়ে ছিল এজন্য তাঁরা সব রকমের মনতাস্তাত্বিক রোগ থেকে মুক্ত থাকতেন।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা যে ব্যক্তিত্বকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তিনি কেবল তার যুগের সকল মানুষ থেকে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিলেন না, বরং দৈহিক দিক থেকেও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

নবীগণের রোগ-ব্যাধি

অনেক আলেম এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেন যে, নবীগণের এমন রোগ হতো না, যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছতার প্রকাশ পায়। কেননা তিনি যদি এরূপ রোগের শিকার হয়ে যান তাহলে প্রচারের কর্তব্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ঘাটতি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

এ ব্যাপারে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ (র) مِرَاْۃُ الْمِنْجَحِ شَرْحِ مِشْكٰوۃِ الْمَصَابِيْحِ। গ্রন্থে লিখেছেন যে নবীগণের দিকে এ ধরনের রোগের সম্পৃক্তকরণও গুনাহের কাজ।

اَلْحَقُّ الْمُجْتَلٰى فِىْ حُكْمِ الْمُتْلٰى صَفَرَ عَفْوَانِ تَقْدِيْمُ -

হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী প্রকাশক, মারকাযে মজলিশে রেজা, লাহোর সেপ্টেম্বর-১৯৯২)

হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগ

এখানে হযরত আইয়ুব (আ)-এর উল্লেখ অশোভন হবে, যার উল্লেখ ইস্রায়েলী বর্ণনায় কুষ্ঠ রোগ এবং জীবাণু ঘটিত বলে নির্ধারণ করেছেন। হযরত আইয়ুব (আ) কখনো শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হননি; বরং তাঁর দেহ মুবারকের ওপর, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি ও ঘামাচি বের হয়েছিল যার দ্বারা তাঁকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযামী (রহ) নবীগণের গুনাহের প্রতিরোধ এবং হযরত আইয়ুব (আ)-এর পবিত্র দেহে কুষ্ঠ রোগের প্রতিবাদ করে লিখেন ঃ

"সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, মায়াযাল্লাহ হযরত আইয়ুব (আ)-এর কুষ্ঠ রোগ ছিল। আবার কিছু অগ্রহণযোগ্য পুস্তকেও একথা লিখিত রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে, এ সকল কথা সম্পূর্ণ ভুল এবং কক্ষনো তাঁর অথবা অন্য কোন নবীর কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ হয় নি।"

এ জন্য এ বিষয়ে সবাই একমত যে, সকল নবী ঐ সকল রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণার কারণ হয়। কেননা নবীগণের ওপর প্রচার ও হেদায়াত করার কাজ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। তাই এ কথা প্রকাশ্য যে, যখন সাধারণ লোকেরা ঐ সকল রোগ-ব্যাধি থেকে ঘৃণা করে তাঁদের থেকে দূরে চলে যাবে তাহলে তাবলীগের কর্তব্য কীভাবে আদায় হবে?" (আযায়িবুল কুরআন পৃ. ২২১, আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী, প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ, ভারত)

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর দুয়া

এটা ঠিক যে, নবীগণের রোগ হতো, তবে তাদের কখনো এ ধরনের রোগ হতো না যা সাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য। নবীগণের মধ্যে কারো কারো রোগ হওয়ার উল্লেখ কুরআন মাজীদে এসেছে। যদি নবীগণ রোগ-ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত থাকতেন তাহলে নবীগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথা বলতেন না– (২৬ নং সূরা শূরার ৭৬ নং আয়াত)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ -

"আর আমি যখন রোগগ্রস্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য প্রদান করেন।"

প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ

কুরআন মাজীদে হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগের উল্লেখ রয়েছে অথচ রোগের নাম বলা হয় নি। এ রোগ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই ছিল। আল্লাহর রাসূলগণ পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও ওফাতের পূর্বে রোগ হয়েছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম (উর্দু) পৃ. ৪২৫)

ইমাম বুখারী (রহ) হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়, ৫৫৪, হাদীস-১৫৭৫)

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তেষট্টি বছরের জিন্দেগীতে সর্বদা সুস্থ ও শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁর মিশন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে পূর্ণরূপে সবল ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ জীন্দেগীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেছিলেন।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য

এ বিষয়ে এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী বাণী খাকসার তাহরীক লিখেছেন ঃ ঊনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) থেকে পর পর পাঁচ বা ছয়জন বাচ্চার সুস্থতার সাথে জন্ম হওয়া এবং পূর্ণ বয়স পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য থাকা, এ কথার প্রমাণ যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বরং তার কোন যৌন অথবা মরণ ঘাতি রোগ ছিল না। তাঁর একষট্টি বছর বয়সে হযরত মারিয়া (রা)-এর গর্ভ থেকে বাচ্চা হওয়া অন্তত তাঁর যৌন শক্তির সুস্থতার অধিক প্রমাণ।

মস্তিষ্কের রোগ যদি তাঁর থাকত তাহলে এ মহান ব্যক্তিত্ব (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা বীরত্ব এবং দৃঢ়তা দ্বারা তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করতে পারতেন না।

এক বিশ্বজনীন ও চূড়ান্ত প্রকারের সমাধান যুক্ত আইন পেশ করতে পারতেন না। বরং স্বীয় (নবুওয়ত ঘোষণার পরের) ২৩ বছরের জীবনবাজি এবং কঠিন অতিবাহনের জীবনে কয়েক বার অসুস্থ এবং কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। (অথচ এরূপ হননি) এর বিপরিত রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ জীবনে তাঁর মৃত্যুর রোগ ব্যতীত অন্য কোনো রোগের কথা শুনা যায় নি। (রাসূলে সাদিক পৃ.-৩২ আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী, তারতীব ও সংক্ষেপ গোলাম কাদীর খাজা।)

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা

মাশরেকী সাহেবের একথা গুরুত্বের দাবি রাখে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর রোগ ব্যতীত কোনো সময়েই অসুস্থ হন নি। যে সকল স্থানে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহের এক এক অংশের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কোনো অসুস্থতার বর্ণনা করেন নি।

স্বাস্থ্য

যখন কোনো মানুষ নিজস্ব অঞ্চলের পরিবেশ ব্যতীত অন্য কোনো শহর অথবা অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন ওখানকার আবহাওয়া এর স্বাস্থ্যের ওপর কোনো না কোনো রূপে প্রভাব ফেলে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিশু বয়সে এবং যৌবন বয়সে ব্যবসায়িক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় স্বাধীন প্রশান্তি অর্জন করেনিলেন। এ ছাড়াও যুদ্ধের জন্য সফর করতে থাকেন, অথচ কোনো দিন অসুস্থ হন নি। সাহাবী আজমাঈন যখন মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন তখন প্রায় সকল সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সময়েও আল্লাহ তায়ালা সুস্থ রেখেছিলেন।

ভ্রমণ

এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী লিখেছেন ঃ সব যুদ্ধের মধ্যে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর মধ্যে শত শত মাইল ভ্রমণ করেছিলেন বরং মাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। কোনো একবারও তাঁকে কোনো রোগে আক্রান্ত করে নি। মদীনার জ্বরের প্রকোপে যা মুসলমান মুহাজিরদের ওপর প্রথম বছর আসে– শুধু রাসূল ﷺ ঐ জ্বর থেকে রক্ষা পান। (রাসূলে সাদেক, পৃ.-৩২, আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী তারতীব সংক্ষেপ, গোলাম কাদীর খাজা)

বিষ মিশ্রিত গোশত

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺকে সারাজীবন রোগ-ব্যাধি থেকে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। এমনকি খায়বরের বিজয় স্থলে যখন হারছ এর কন্যা যীনত (সালাম বিন মাশকাম ইয়াহুদীর স্ত্রী) বকরির ভুনা গোশত রাসূল ﷺ-এর খিদমতে দিল। এ গোশত বিষমিশ্রিত ছিল। নবী করীম ﷺ-এ গোশত থেকে এক টুকরো উঠিয়ে মুখে রাখেন এবং চিবানোর পর তা থু থু করে ফেলে দেন। এক সাহাবী বশর বিন বারা (রা) এক লোকমা খেয়ে মারা যান অথচ আল্লাহ তায়ালা হুজুর ﷺকে রক্ষা করেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মহিলা স্বীকার করে যে, গোশত বিষাক্ত ছিল। সে আরো বলে ঃ

"আমি মনে করেছি যে, যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা বিষ দ্বারা আপনার নিকট থেকে মুক্তি পাব, আর আপনি যদি নবী হন তাহলে অবশ্যই আপনি এ বিষয়ের সংবাদ পেয়ে যাবেন।" (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় নং ৫১০, হাদীস নং-২৮৮) (ইবনে হিশাম খ-২, ২৩২-২৩৩ পৃ. (তিব্বে নববী, পৃ-২৩৬, ২৩৭, ইবনে কাইয়িম)

১৩. নবী করীম ﷺ-এর বুঝ ওমেধা

প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এ কারণে তিনি সকল লোকের চাইতে মেধা ও যোগ্যতার দিক দিয়েও পূর্ণতার ও উন্নততম ছিলেন। তিনি বুঝ, বীরত্ব, প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও অদ্বিতীয়।

পূর্ণত্ব

নবী, রাসূল পথ প্রদর্শক এবং ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তায়ালার দিক-নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। নবীগণের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা সারা পৃথিবীর সকল ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে। এরূপভাবে আমাদের নবী-কারীম ﷺ-এর জ্ঞানও সারা পৃথিবীতে বসবাসরতদের মধ্যে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ।

রাসূল ﷺ-এর জ্ঞান

এভাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আসসালিহী "সুবুলুল হুদা"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যদি জ্ঞানের একশত অংশ ধারণা করা যায় তাহলে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে প্রদান করেছেন এবং এক অংশকে সারা পৃথিবীবাসীকে প্রদান করেছেন।" (সুবুলুল হুদা, খ-৭, পৃ. ১১ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী)

একশ ভাগের একভাগ জ্ঞানের পূর্ণত্ব

যদি এ কথার আলোকে বিভিন্ন স্তরের মেধাবী লোকদের কার্যাবলির এবং সার্বিক হিসাব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পূর্ণমানব ইতিহাসের জ্ঞান হরণকারী কার্যাবলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি উদঘাটন, পূর্ণ জাতির উপকারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবলির ব্যাপারে অভিজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গির হিসাব গ্রহণ করে আজকের মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। যেহেতু এ সকল মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ একশত ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম তাহলে রাসূল ﷺ এর জ্ঞানকে কিভাবে আন্দাজ করতে পারে? যার একার জ্ঞানের ভাগ হলো ৯৯ (নিরানব্বই)।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব

এভাবে সম্মানিত পীর শাহ আল আযহারী (রহ.) "দ্বিয়াউন নবীতে" উল্লেখ করেনঃ "নবী কারীম ﷺ এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নাই যে, নবীগণের সরদার স্বীয় বিশাল বিজ্ঞতার দ্বারা সকল প্রকারের লোকদের ইসলামের সাঁচে এভাবে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন যে, তার মেজাজ ও ফিতরাত (প্রকৃতি) পরিবর্তন করে রেখে দিবেন। (দ্বিয়াউন নবী ﷺ খ-৫, পৃ. ২৭১ মুহাম্মদ করম শাহ, প্রকাশক দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশনস, লাহোর।)

জ্ঞানকে অপরাগকারী সীরাত

কাজীউল কুযাত (বিচারকদের বিচারক) কাজী ইয়াজ রহমাতুল্লাহ স্বীয় পৃথিবী খ্যাত কিতাব কিতাবুশ শিফা বি তারীফি হুকুমিল মুস্তফা'তে লিখেন ঃ

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হুজুর ﷺ সকল মানুষের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। যদি কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক রাসূল ﷺ-এর চিন্তা-তদবিরের ওপর সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে যা স্বীয় খোদায়ী সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়গুলোর সংশোধনের জন্য বাছাই করেছেন এবং হুজুর ﷺ-এর সচ্চরিত্র ও বিস্ময়কর জীবন কাহিনী সামনে রেখে যখন তাঁর রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর দৃষ্টি বুলাবে, যা হুজুর ﷺ সকল বিশেষ ও সাধারণ বিষয়ের সাথে বিবেচনা করে এর সাথে এ খেয়ালও রাখে যে, হুজুর ﷺ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন নি। অতীতের কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না, কোন কিতাবও অধ্যয়ন করেন নি।

এতদ্‌সত্ত্বেও কীভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর প্রবাহিত করে ছাড়লেন। আহকামে শরীয়তকে কীভাবে আন্দাজে পেশ করলেন যে, শোনার সাথে সাথে শ্রোতার মেজাজ তা না মেনে উপায় নেই। এ সকল বক্তব্যের ওপর দৃষ্টি দেয়ার পর একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, সর্বশেষ নবী জ্ঞান-বুদ্ধিতে সকলের পূর্ণ চন্দ্রেরও সামনে এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, এ পন্থার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। (কিতাবুশ শিফা বিতারীফী হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-১২৯, ১৩০, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী)

বিশাল জ্ঞানের অধিকারী

ইহা এমন এক বক্তব্য যে সম্পর্কে কোনো লম্বা চওড়া বিশ্লেষণ বা বক্তৃতার আবশ্যকতা নেই। কেননা এ বক্তব্য গৃহীত এবং সুপ্রসিদ্ধ বটে। এখানে নবী করীম ﷺ-এর জীবনের একটি ঘটনা নকল করা হলো যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর ﷺ অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও বুঝ ও চৌকষ-এর দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিলেন।

যখন মক্কার কুরাইশগণ কাবা শরীফের নির্মাণ করতে বিল্ডিং এর জন্য প্রত্যেক গোত্র পৃথক পৃথক পাথর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল এবং তৈরি করতে মশগুল রইল। যখন এ বিল্ডিং রুকন পর্যন্ত পৌছাল তখন প্রত্যেক গোত্র চাইলো যে, তারা তা পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল যে, হত্যা-যজ্ঞ পর্যন্ত যাবে। প্রত্যেক গোত্র ঝগড়ার দিকে অগ্রসর হলো।

বনু আব্দুদ্দার এক পেয়ালা রক্ত ভরে রাখলো এবং তাদের সকল সঙ্গীদের হাত এ রক্তে চুবিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। রক্তের মধ্যে হাত ডুকানোর অর্থ এই ছিল যে, আমরা জীবন দিব; কিন্তু পিছু হটবো না।

এ ধরনের উত্তেজনার মধ্যে চার-পাঁচ রাত অতিক্রম হলো এবং কোনোভাবে এ বিষয়ের কোনো সমাধান হলো না। সর্বশেষ সকল কুরাইশ মসজিদে হারামে সমবেত হয়ে পরামর্শ করতে থাকে কি করা যায়? কুরাইশদের সবচে' বয়স্ক বুজুর্গ আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখযুম বলেন ঃ

হে কুরাইশ! তোমরা এক কাজ করো– তোমাদের যে ব্যক্তি দরওয়াজা দিয়ে মসজিদে আসবে তার ফায়সালা মেনে নাও এবং তিনি যে ফায়াসালা করেন তা মেনে নাও। ইবনে সায়াদ-এর বর্ণনা মুতাবিক এ রায় স্থান পায় যে, নবী শায়বা দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রথম প্রবেশ করবে তিনি হাজারে আসওয়াদ রুকনের ওপর উঠাবেন, সকলে এরপর সম্মতি প্রকাশ করেন এবং এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। লোকেরা দরওয়াজার দিকে অপেক্ষা করে বসে থাকে যে, যে ব্যক্তি আসবে আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নিব। এ সময় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ রাখেন। সকল লোক তাঁকে দেখে খুবই খুশি হন এবং বলতে থাকেন ঃ "অবশ্যই ইনি আল-আমিন। তিনি যে ফায়াসালা করবেন আমরা এর ওপর খুশি আছি। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌছালেন তখন সবাই বললেন ঃ আমরা আপনার ফায়াসালা মেনে নিয়েছি, আপনি ফায়সালা করে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট এক খণ্ড কাপড় নিয়ে আস। লোকেরা কাপড় নিয়ে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা হাজারে আসওয়াদ কাপড়ের ওপর রেখে ঘোষণা করেন ঃ

তোমরা সব লোক সকল গোত্র থেকে এই কাপড় ধর এবং একে উঠিয়ে দেওয়ালের পাশে নাও। যখন সকল গোত্রের লোকেরা এই কাপড় (যার মধ্যে হাজারে আসওয়াদ ছিল) এর স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ওটাকে উঠিয়ে দেওয়ালে রেখে দেন। এভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর ওপর ভবন হতে থাকে। (সীরাতে ইবন হিশাম, খ-১, পৃ.-১২৭, তবাকাতে ইবন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২২৫, তারীখে তাবারী, খ-১, পৃ.-৬৮)

বিভিন্ন গোত্রের নির্ভরশীলতা

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এই প্রজ্ঞা ও বীরত্ব যুদ্ধের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গোত্রগুলোকে রক্তপাত থেকে বাঁচাল। এ ঘটনা থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শসলিস বানানোর সময় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তাঁর

বুঝ ও ধীশক্তির ওপরে সকলের পূর্ণ নির্ভরতা ছিল। তাঁরা জানতেন যে, তিনি সবচেয়ে মেধাশক্তিসম্পন্ন। কেননা কোনো পন্থা অবশ্যই বের করবেন যার ওপর সকল গোত্র একমত হয়ে যাবেন।

প্রকাশ্য অপ্রাকাশ্য অবস্থার ওপর অগ্রিম সতর্ক

নবী কারীম ﷺ-এর জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে আল্লামা যাইনী দিহলান আসসীরাতুন নব্বীয়াহ'তে লিখেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীব নবী ﷺ কে সকল সৃষ্টির প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়ের ওপর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যাতে মহানবী ﷺ অবস্থার সংশোধন করতে পারেন এবং উত্তম অবস্থাগুলোর দিকে লোকদেরকে দিকনির্দেশনা দেন।

আল্লাহ তায়ালা নবী কারীম ﷺ কে তাঁর সকল বান্দার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিতে পারেন এবং এ কাজ এ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়াবলির সংশোধন না করেন এবং এ কথার পরিধি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়াবলী জানার ওপর নির্ভর করে এ জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী ﷺ কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তৈরি করেছিলেন।

হুজুর ﷺ সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সামষ্টিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন, যার দ্বারা তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থার দাবী পূর্ণ হত। (সীরাতে নব্বীইয়াহ, খ-৩, পৃ. ২৩, আহমদ ইবনে যাইনী দিহলান। দ্বিয়াউন নবী ﷺ খ-৫, পৃ.-২৭২)

জ্ঞানগত মর্যাদা

কাজীউল কুজাত আল্লামা কাজী ইয়াজ (র) রাসূল ﷺ-এর জ্ঞানগত মর্যাদার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاً وَّ اَفْضَلُهُمْ رَاْيًا .

"নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সকল লোকের চাইতে উত্তম ছিল। সকল বিষয়ে হুজুর ﷺ-এর মত সকল লোকের মত থেকে উত্তম ছিল।" (কিতাবুশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-৮২ কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।)

মরুভূমির অনুকণা

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) থেকে এ বর্ণনা ও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মানব সভ্যতার শুরু থেকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে যে, বুঝ ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, ঐ বুঝ ও প্রজ্ঞা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুকাবিলায় এতটুকুও নয় রেত-এর একটি কণা দুনিয়ার সকল মরুভূমির কণার তুলনায় যা হয়। (দ্বিয়াউন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ-৫, পৃ. ২৭৩, পীর মুহাম্মদ করম শাহ্, দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর)

নিরক্ষর নবীর বুঝ ও প্রজ্ঞা

ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝ ও মতের দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন (যিনি কোনো শিক্ষকের নিকট পড়েন নি) ছিলেন, অথচ জ্ঞান ও মতামতের দিক থেকে সকলের থেকে ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।" (আরবের ইতিহাস পৃ.-১০৩, মসিয়ে সিদিভ, অনুবাদ মৌলভী আব্দুল হালীম আনসারী)।

চূড়ান্ত পর্যায়ের ধীশক্তি সম্পন্ন

ইংরেজ ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে স্বীয় পুস্তক (Hero and Hero Wdrship)-এ লিখেছেন :

একথা ঠিক যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর্যবেক্ষণ ছিল গভীর এবং স্মৃতিশক্তি ছিল প্রচণ্ড রকমের।"

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবী, পৃ.-৪১, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া খান, জাহানজীব বুলাক, আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর)

বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ

ইউরোপের এক বড় মর্যাদাশালী কে. টি. লাওল এর বক্তব্য হলো ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বড় রাষ্ট্রপতি, একজন বড় বিজয়ী, অনেক বড় জ্ঞানী ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি পাগল ছিলেন কিনা

মক্কার কাফিরগণ যখন প্রতিরোধের কোনো সাধারণ ভাষা হারিয়ে ফেলল তখন তারা তাঁকে পাগল বলতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হাকীমে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ -

"হে প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার রবের করুণায়, পাগল নন।"

কুরআন মাজীদের এ ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা সার্বক্ষণিক অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনি পাগল নন, পাগল ছিলেন না এবং কখনো পাগল হবেন না।

হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের গুরুত্ব দেয় (এর সম্মান রক্ষা করে) সে পাগলামি এবং মাথা খারাপ হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কোনো কোনো বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এর জ্ঞান কখনো লোপ পাবে না (অর্থাৎ সে বোধহীন হবে না)। (মাওয়াহিবুর রহমান, প্যারা-২৯, পৃ. -২৮, সাইয়েদ আমীর আলী মালহাবাদী)

এ তো ঐ ব্যক্তির মর্যাদা যিনি কুরআন মাজীদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর মর্যাদা কী হবে?

১৪. রাসূল -এর দৈহিক শক্তি

পাহলোয়ানদের চাইতেও অধিক শক্তি

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মর্যাদাবান বান্দা নবী করীম-কে প্রচুর দৈহিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) "মাদারিজুন্নবুওয়াত" গ্রন্থে লিখেন ঃ হুজুর আকরাম-এর শক্তি, বাহুর শক্তি এবং মজবুতি এতই ছিল যে, বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর (পাহলোয়ান) তাঁর সামনে দাঁড়াতেও পারত না।

রুকানা পাহলোয়ান

রুকানা আরবের একজন বিখ্যাত পাহলোয়ান ছিলেন, যার দৈহিক শক্তির বিশাল সুখ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি এক শত লোকের মুকাবিলা করে পরাজিত করে দিতেন। এ ব্যাপারে সুনানে তিরমিযিতে রয়েছে–

"একদিন নবী করীম আরবের কোন পাহাড়ি এলাকায় মক্কার কোনো ঘাঁটি) চলতে চলতে রুকানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বিশ্ব নেতা এর এ অভ্যাস ছিল যে, যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন হুজুর তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত অবশ্যই দিতেন।

যেহেতু হুজুর রুকানাকেও দাওয়াত দিলেন যে, তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবা করে নাও এবং অংশীহীন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আন।

রুকানা বলল, আমি এক শর্তের ওপর এ দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত আছি, তা হলো এই যে, যদি আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে আমি ঈমান আনবো।

হুজুর নবী করীম এ শর্তে রাজী হলেন এবং ইরশাদ করেন ঃ রুকানা! যদি তুমি এ শর্তের ওপর ঈমান আনার ওয়াদা কর তাহলে আমি এ শর্ত পূরণ করতে তৈরি আছি।

সাথে সাথে রুকানা নেংটি পরে ময়দানে এসে দাঁড়াল। রাসূল ও তাশরীক নিলেন। রাসূল বাজু (বাহু) ধরলেন এবং এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে ফেলে দিলেন। সে হয়রান এবং পেরেশান হয়ে গেল, কিন্তু পুনরায় উঠল এবং বলতে থাকল ঃ

"আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অসাবধানতার মধ্যে আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনি আমাকে আরেকবার পরাজিত করতে পারলে আমি ঈমান গ্রহণ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুতি নিলেন, তার বাহু ধরে ফেললেন এবং জমীনের ওপর ফেলে দিলেন। তার এ ব্যাপারে সামান্যতম ধারণা ছিল না যে তাকে ফেলে দেয়া যাবে। লজ্জিত অবস্থায় আবার উঠলেন এবং তৃতীয়বারের মতো আবার কুস্তির দাওয়াত দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ কথা বলেন নি যে, দু'বার আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি এবং আল্লাহর রাসূল পুনরায় তার সঙ্গে কুস্তি লড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমনভাবে ঝটকা দিলেন যে, চোখের পলকে জমীনে ফেলে দিলেন। সে এবার আর অস্বীকার করতে পারল না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কালিমা শাহাদাত পড়েন এবং ঘোষণা করেন যে, ইহা কোনো দৈহিক শক্তি নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রূহানী শক্তি দ্বারা তিনবার পরাজিত করেছেন। আমি একথা স্বীকার করে নিলাম যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল।

কুস্তিগীর আবুল আসাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রুকানা ছাড়াও আরো অনেক লোক কুস্তি লড়াই করেছেন এবং তিনি সকলের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। এদের মধ্যে আবুল আসাদ নামের একজন কড় কুস্তিগীর ছিলেন। যে গরুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে যেত এবং লোকজন তার নীচ থেকে চামড়া টেনে বের করার পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। চামড়া ফেটে যেত কিন্তু নীচ থেকে বের হতো না।

একদিন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কুস্তি লড়তে চাইলেন। তিনি আরো বললেন, যদি আপনি আমাকে জমীনের ওপর ফেলতে পারেন তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনবো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জীমনের ওপর চিৎ করে ফেলে দেন অথচ সে ঈমান আনেনি।

পরিপূর্ণ পবিত্র দেহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রকমের পবিত্র ছিল। হযরত উম্মে মা'বাদ (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেট বড় হওয়া এবং পেট সামনের দিকে বেড়ে যাওয়ার দোষমুক্ত ছিলেন। (আল অফা বিআহওয়ালি মুস্তফা, পৃ.-৪৫২, ইমাম আব্দুর রহমান ইবন জাওযী।)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক ভারসাম্যপূর্ণ ছিল।

দ্রুত চলমানতা

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ "আমি দ্রুত চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দ্রুত আর কাউকে দেখিনি। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতেন তখন মনে হতো জমীন নিজে নিজে জড়িয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি চলতেন তখন পূর্ণ শক্তি দ্বারা চলতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলন বড়ই মাপা মাপা হতো এতদসত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গতির মুকাবিলা কেউ করতে পারতো না। (কিতাবুশ শিফা, পৃ.-৮২, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।) (দ্বিয়াউন নবী খ-৫, পৃ.-২৭৪, পীর করম শাহ, আজহারী, দ্বিয়াউল কুরআন পাবঃ লাহোর।)

এ দীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নবীগণ (আ) সকল প্রকারের ঘৃণার উদ্রেককারী রোগমুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তায়ালা এ সকল রোগ থেকে রক্ষা করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক বুঝ ও মেধা এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ছিলেন।

সমাপ্ত